Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

সপ্তম বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রায় পৃথিবীর আকৃতির নতুন সাত গ্রহের সন্ধান

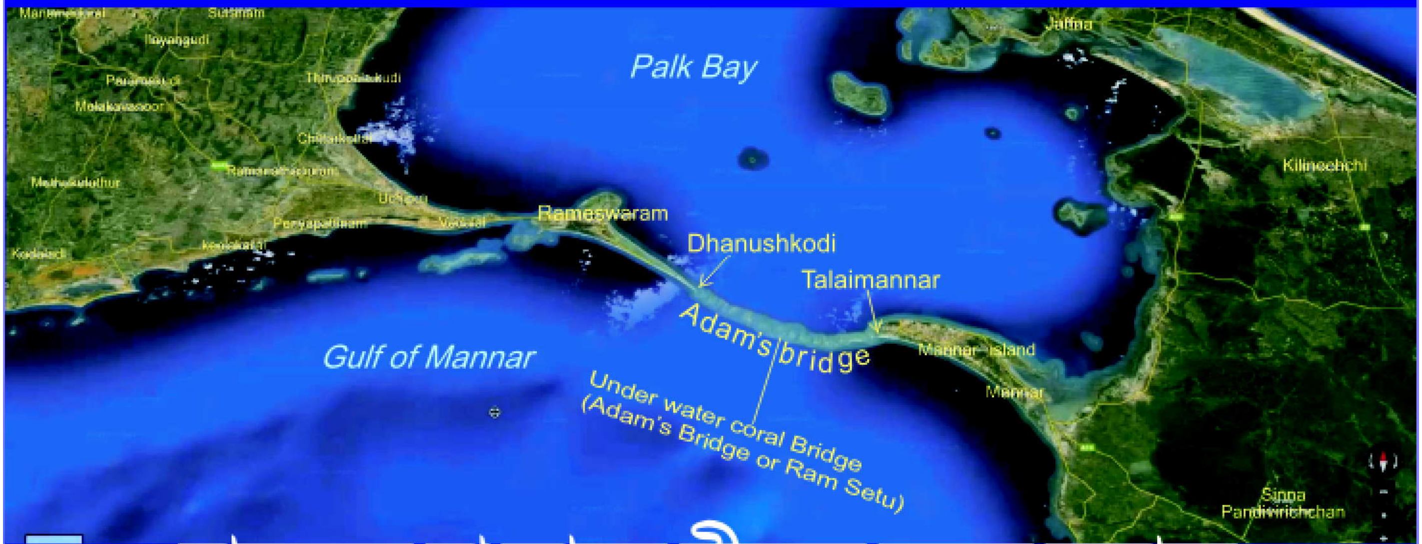

রামসেতু বা আদমব্রীজের রহস্য সন্ধানে

- ◆সম্পাদকীয় ঃ হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি'র অপব্যাখ্যা ভাববাদের নামান্তর
- ◆বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভব ও বিকাশ
- ◆বিজ্ঞান এবং শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে ৯ই অগাস্ট দেশব্যাপী পদযাত্রা
- ◆চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল-হকিকত এবং সমাধানের উপায়

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি'র অপব্যাখ্যা ভাববাদের নামান্তর	৩
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	৯ই অগাস্ট দেশব্যাপী পদযাত্রা	৫
	গোরক্ষপুর সহ উত্তরপ্রদেশে শিশুদের মৃত্যু মিছিল চলছে	৬
	বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানীদের আন্দোলন	৬
	গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঃ একটি কর্পোরেট প্রচার	৬
	সৌর অভিযানে নাসার মহাকাশ যান	৮
	পৃথিবীর দেড়গুণ বড় গ্রহের খোঁজ	৮
	প্রায় পৃথিবীর আকৃতির নতুন সাত গ্রহের সন্ধান	৮
	পালসার-এর সন্ধান	৯
	ফিরে পাওয়া	৯
	প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহের সংঘর্ষ এড়ালেন বিজ্ঞানীরা	৯
	ল্যান্ড মাইনের খোঁজ দেবে জি এম ব্যাকটেরিয়া	৯
	বিগ ব্যাং-এর পরবর্তী ধাপ	১০
	বায়ু থেকে জল সংগ্রহ	১০
	"ব্লাড ফলস" এর উৎস সন্ধানে	১০
	এভারেস্ট প্রসঙ্গে	১১
	প্রজাতির সন্ধানে	১১
	জীবাশ্মের সন্ধানে	১১
	এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ	১২
	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যেই গণহারে শিশুহত্যা	১২
খোলা জানালা ঃ	মঠ-মিশন-এন জি ও-দের দান-ধ্যান মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে	১৩
বিশেষ রচনা ঃ	বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভব ও বিকাশ	১৪
বিশেষ নিবন্ধঃ	রামসেতু বা আদম ব্রীজ'র রহস্য সন্ধানে	২০
প্রবন্ধ ঃ	চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল-হকিকত এবং সমাধানের উপায়	২৬
	সোভিয়েত রাষ্ট্রে আপতকালীন চিকিৎসা	৩১
রিপোর্ট ঃ	রাজ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী আইন চালু করতে কনভেনশন	৩৬
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৭
পাঠকের কলাম ঃ	প্রকৃতি বিজ্ঞানে 'কার্ল লিনিয়াস'-এর অবদান	৪০
সংগঠন সংবাদ ঃ		৪১

সম্পাদকীয়

হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি'র অপব্যাখ্যা ভাববাদের নামান্তর

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১৮০৩ সালটি হ'ল কণাপদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ঐ সালেই বিজ্ঞানী জন ডালটন তার পরমাণুবাদ প্রকাশ করেন যা ডালটনের পরমাণুবাদ নামে খ্যাত। ঐ তত্ত্বের অনেকগুলি স্বীকার্যের মধ্যে অধিকাংশই পরবর্তীকালে বেঠিক প্রমাণ করেছে। বেঠিক প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য তত্ত্ব। কারণ, বিজ্ঞানের বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করতে হলে এটিকে বাতিল করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্ঠিপাথরে প্রকৃতিতে ঘটে চলা ঘটনাগুলিকে যাচাই করতে করতেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়। আজকের চেতনায় যা সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে আগামী দিনের উন্নত চেতনায় তা অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। এমন ঘটনা বিজ্ঞানে প্রায়শই ঘটে থাকে। এটাই বিজ্ঞানের বিকাশের স্বাভাবিক প্রবণতা। আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ডালটনের পরমাণুবাদের অন্যতম স্বীকার্যে, ডালটন বলেছিলেন পরমাণু অবিভাজ্য, অর্থাৎ পরমাণুকে টুকরো করা যায় না। এই বিশ্বাস ভঙ্গ হতে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় ৯৪ বছর। কারণ, ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী জে. জে থমসন ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়ে দেন যে পরমাণু বিভাজ্য। তিনি প্রমাণ করেন পরমাণুর মধ্যে রয়েছে তড়িতাহিত কণা-ইলেক্ট্রন। ইলেকট্রন হ'ল অপরা তড়িতাহিত কণা। পরবর্তীকালে পরমাণুর মধ্যে পরা তড়িতাহিত কণা প্রোটন ও নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন-এর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তার বিখ্যাত স্বর্ণ-ফলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন পরমাণুর দুইটি অংশ রয়েছে। একটি হ'ল পরমাণুর কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াস এবং অন্যটি হল নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অংশ। পরমাণুর কেন্দ্র হল স্থির ও তাতে অবস্থান করে প্রোটন ও নিউট্রন। ফলে কেন্দ্রটি পরা তড়িৎধর্মী। অন্যদিকে ইলেকট্রনের অবস্থান নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চলে এবং তা অস্থির বা গতিশীল। ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী নীলস বোর, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হাইড্রোজেনের উপর পরীক্ষা করে দেখান ঐ পরমাণুর একমাত্র ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে দুরন্ত গতিতে ঘুরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী বোর গাণিতিক ভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ্য, ইলেকট্রনের গতিবেগ ও ইলেকট্রনের শক্তির হিসাব কষে দেখান। এই বিষয়গুলি একত্রে বোরের তত্ত্ব হিসাবে খ্যাত। বোরের হিসাব অনুযায়ী হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষে ইলেকট্রনের গতিবেগ প্রায় ২১৮০ কি. মি প্রতি সেকেন্ডে। অর্থাৎ এক সেকেন্ডে ইলেকট্রনটি কলকাতা থেকে প্রায় কন্যাকুমারী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তবে এই সব গণনা ছিল গাণিতিক।

এরই মধ্যে ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে ঘটে গেল আর এক বিপ্লব। বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণ বস্তুর তাপীয় বিকিরণের উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে কোন বস্তু হতে বিকিরত তাপ শক্তি কণার আকারে নির্গত হয়। এই কণাগুলিকে প্ল্যাঙ্ক নাম দিলেন 'কোয়ান্টা'। এই কোয়ান্টার গতিবিধি-র নিয়ম সনাতনী বল বিদ্যা (Classical Mechanics) অপেক্ষা ভিন্নতর। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ডি ব্রগলী, হাইজেনবার্গ, স্ক্রডিঞ্জার, জিরাক প্রভৃতি বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশ সাধন করেন।

১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী ডি ব্রগলী একটি তত্ত্বে বললেন – প্রতিটি গতিশীল বস্তুর দুইটি ধর্ম রয়েছে – কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম। বোর তার তত্ত্বে ইলেকট্রনের কেবলমাত্র কণা ধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, তরঙ্গ ধর্মকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। এটা হ'ল বোর তত্ত্বের অন্যতম ত্রুটি। ডি ব্রগলী হিসাব করে দেখালেন ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণা থেকে শুরু করে অতিকায় বৃহৎ বস্তুরও দ্বৈত্ব ধর্ম রয়েছে। তবে ক্ষুদ্রকণার ক্ষেত্রে তা একেবারেই নগণ্য। ১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী ডেভিসন ও জারমার পরীক্ষার মাধ্যমে ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণ করেন ও ডি ব্রগলী তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করেন।

বিজ্ঞানীদের মনে রহস্যের জাল ঘনীভূত হতে থাকল। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান কি? তার গতিবেগই বা কত? গণিতের জালে ইলেকট্রন ধরা দিয়েও তা বার বার পিছলে যাচ্ছে। এ যেন প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের লুকোচুরি খেলা! অতঃপর ঐ একই বছরে অর্থাৎ ১৯২৭ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ হাজির করলেন সেই তত্ত্ব যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে **হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি** হিসাবে খ্যাত। হাইজেনবার্গ বললেন, ইলেকট্রন এতটাই উচ্চগতি সম্পন্ন এবং তার ভর এতটাই কম যে ইলেকট্রনের অবস্থান ও তার গতিবেগ একই সাথে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ইলেকট্রনের অবস্থানকে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে গেলে তার গতিবেগ হয়ে যাবে

অনিশ্চিত আবার গতিবেগকে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে গেলে তার অবস্থান হয়ে পড়বে অনিশ্চিত। অর্থাৎ অবস্থানের অনিশ্চয়তা ও গতিবেগের অনিশ্চয়তা পরস্পর ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তনশীল। তিনি এই দুই অনিশ্চয়তার গাণিতিক সূত্র প্রকাশ করলেন। তত্ত্বগতভাবে হাইজেনবার্গের নীতি সকল প্রকার (ক্ষুদ্র ও বৃহদাকৃতি) কণার জন্য প্রযোজ্য হলেও, বৃহদাকৃতি বস্তুর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রভাব বাস্তবতঃ নেই। এমনকি একটি গতিশীল টেনিস বলের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার তত্ত্বের প্রভাব অত্যন্ত কম। এই অনিশ্চয়তা তত্ত্বকে গোড়া থেকেই অতি সরলীকরণ করার প্রবণতা দেখা যায় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মহলে। তৎকালীন বিজ্ঞানী সমাজ প্রাথমিকভাবে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন প্রকৃতিতে সকল চলমান বস্তুর গতিপ্রকৃতি অনিশ্চিত, তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। অর্থাৎ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি কেবলমাত্র পরমাণুর অভ্যন্তরে নয়, প্রকৃতির সর্বত্রই প্রযোজ্য। এটিকে গণিতের নিয়মে শৃঙ্খলায়িত করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত অবধারিত ভাবে ভাববাদের নামান্তর। 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে চলেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘটনা' – এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। তাদের কাছে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের নিশ্চিত পরিণতি হ'ল অদৃষ্টবাদ, এখানে মানুষের কিছুই করার নেই। সবই উপর ওয়ালার হাতে, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। অনেকে আবার কণা পদার্থবিদ্যার গন্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে – অর্থশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব এমনকি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা নীতির প্রয়োগ ঘটানোর দুঃসাহসিকতা দেখান। তাদের কথায় সমাজ গতিশীল কিন্তু তার গতিশীলতা অনির্ণেয় অর্থাৎ আগামী দিনে সমাজের রূপ কি হবে তা অনিশ্চিত। এমন সরলীকৃত বিশ্লেষণ রাখার সময় তারা ঐ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থান-কাল সম্বন্ধে অবিবেচকের মতো আচরণ করেন। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতি, তার অবস্থান ও শক্তির পরিমাপ কতগুলি অপকেন্দ্রক (Centrifugal) বল, স্থিরতড়িতাকর্ষ ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ বলগুলির পারস্পরিক সমতা বিধানের মাধ্যমেই পরমাণু হতে শক্তি নির্গত হয় বা শোষিত হয়। অন্যদিকে সমাজ বিকশিত হয় সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের সাথে সাথে, সমাজের শ্রেণীগুলির অন্তঃদ্বন্দ্বের বিকাশ ও তার সমাধানের সাথে সাথে। এই বিকাশের নিয়মগুলি একটি বিজ্ঞান – একটি সৃজনশীল বিজ্ঞান। তাই অর্থশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নীতির প্রয়োগ করতে যাওয়ার প্রচেষ্টা হল চরম হাতুড়েপনা। এমন ধারণা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শনকে খন্ডন করে ও ভাববাদী দর্শনকে সমর্থন করে। বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের বিজ্ঞানে অবদান প্রসঙ্গে পোপ একবার বলেছিলেন, "Nature and Nature's Laws lay hid in night. God said, 'Let Newton be!' and all was light" অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিয়মগুলি অন্ধকারে ছিল লুক্কায়িত, ঈশ্বর কহিলেন, নিউটনের আবির্ভাব হউক, আর সমস্ত কিছু হ'ল আলোকিত। এমন ভাববাদী ধারণাকে বিজ্ঞান প্রশয় দেয় না। সমস্ত কিছু আলোকিত হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রকৃতির সকল নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এমনটা বিজ্ঞান মনে করে না। তৎকালীন সময়ে বহু বিজ্ঞানী অনিশ্চয়তা নীতিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবেই দেখতেন। অনিশ্চয়তা সূত্রটিকে নিয়ে তুমুল বিতর্কে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। অনিশ্চয়তাকে বিজ্ঞান জয় করবে – এই ধারণার পক্ষে ছিলেন আইনস্টাইন। হাইজেনবার্গকে আইনস্টাইন মজা করে একবার বলেছিলেন, 'তোমার ঈশ্বর পাশার ঘুঁটি নিয়ে খেলছেন না'। 'God is not playing dices'. যাই হোক, পরবর্তী কালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশ, বর্ণালী বিজ্ঞান (Spectrology)-এর বিকাশ ইলেকট্রন সম্বন্ধে ধারণাকে অনেক স্বচ্ছ করেছে।

গ্রহ বা উপগ্রহের অবস্থান ও তার গতিবেগ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'সম্ভাব্যতা' শব্দটি বর্তমানে একেবারেই প্রযোজ্য নয় কারণ তা নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূপূর্ব সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে যে বিজ্ঞান অনিশ্চয়তাকে জয় করে চলেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক প্রগতি ইলেকট্রন ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলিকে আরও বিশদ ভাবে জানতে সাহায্য করছে। আধুনিক সমাজে ইলেকট্রনিক্সের প্রয়োগ, কম্প্যুটারের বিকাশ, হিগস বোসন কণার আবিষ্কার প্রমাণ করে প্রকৃতিকে জানা বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনিশ্চয়তাগুলিকে দূর করে চলেছে ও আগামীদিনে আরও সফল হবে।

বর্তমান আর্থসামাজিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনে কেবল অনিশ্চয়তাই প্রদান করে। সাধারণ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা দূর করার কোন সমাধান পুঁজিবাদের হাতে নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানই সামাজিক জীবনে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। এই সত্যটা পুঁজিবাদীরা গোপন করতে চায় – আপামর মানুষকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে চায়। অনিশ্চয়তা নীতির অপব্যাখ্যা পুঁজিবাদের পক্ষেই যায়। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ জানেন যতদিন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে ততদিন অপবিজ্ঞান, অবিজ্ঞান টিঁকে থাকবে – বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যাও টিঁকে থাকবে।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

বিজ্ঞান এবং শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে ৯ই অগাস্ট দেশব্যাপী পদযাত্রা

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমাবে, বিজ্ঞান বিরোধী গবেষণায় (যেমন গোমূত্র-গোবর 'সর্বরোগহরা' প্রমাণ করার, রামসেতুর অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি) বেশি বেশি অর্থ বরাদ্দ করবে। এর বিরুদ্ধে দেশের বিজ্ঞানীরা মৌলিক গবেষণায় অর্থহ্রাস, বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চায় অর্থ বরাদ্দ, সার্বিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন।

"মার্চ ফর সায়েন্স" ব্যানারে গত ৯ই অগাস্ট ২০১৭ দেশব্যাপী পদযাত্রা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ডাকে গত ৯ই অগাস্ট ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী সহ ৪০টি শহরে এই পদযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন। বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের গবেষক, বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের অনুরাগীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরাও নিজস্ব ব্যানার নিয়ে কলকাতার মিছিলে অংশ নেয়।

কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজিত সমাবেশে প্রায় দুই হাজার মানুষের জমায়েত হয়। সমাবেশ থেকে বিকাল ৪টা নাগাদ পদযাত্রা শুরু হয় এবং বৃষ্টির মধ্যেও না থেমে পরিক্রমা শেষ হয় এসপ্ল্যানেডে।

"ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স"-এর আয়োজকদের তরফে বলা হয়েছে –

"স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষাখাতে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের যে দাবি, তাকে মর্যাদা না দিয়ে সরকার তা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থসংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেখানে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের গবেষণা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আই আই টি, এন আই টি এবং আই আই এস ই আর-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে গুলিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে অর্থবরাদ্দ হত সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বরাদ্দ হয়েছে এবং সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফি বৃদ্ধি করে ছাত্রদের থেকে তা সংগ্রহ করতে। গবেষণার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থা অর্থবরাদ্দ করে থাকে যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ডি এস টি), ডিমার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি (ডি বি টি) ইত্যাদি, এদেরকে অতি অল্প বাজেটের মধ্যে কাজ চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বড় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)-এর যে সংস্থা 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (সি এস আই আর) আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং তাদের পরিচালিত গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে নিজস্ব গবেষণায় অর্থের জন্য বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের তাদের আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনা বিক্রি করে বর্ধিত বেতনের ৩০ শতাংশ উপার্জন করতে নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন সরস্বতী নদীর অবস্থান এবং রামসেতুর অবস্থান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যার বর্তমান সময়ে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা নেই।"

দাবিসমূহ

১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে জিডিপি'র ৩ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।

২। অবৈজ্ঞানিক রহস্যবাদী ধারণার প্রসার, অপবিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ এবং প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত অযৌক্তিক দাবি বন্ধ করতে হবে।

৩। প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি চালু করতে হবে – যা শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত ধারণাকেই শিক্ষা দেবে।

৪। সমস্ত সরকারি নীতিকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নির্ভর হতে হবে।

৫। শিক্ষা খাতে অর্থবরাদ্দ বাড়াতে হবে।

সমাবেশে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন উপস্থিত ছিল। দাবি সম্বলিত সুসজ্জিত প্ল্যাকার্ড; বিজ্ঞানীদের ছবি নিয়ে পদযাত্রা হয়। সভায় বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ অমিতাভ রায়চৌধুরী সমাবেশে বলেন "এই আন্দোলন শুধু বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য নয়, শিক্ষার প্রসারের জন্যও। তাই আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত "India March for Science and Education." ■

গোরক্ষপুর সহ উত্তর প্রদেশে শিশুদের মৃত্যু মিছিল চলছে

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের বি আর ডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল পি কে সিং গত ৩০শে অগাস্ট সংবাদ সংস্থাকে সরকারিভাবেই জানিয়েছেন যে গত ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে অগাস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র এই একটি হাসপাতালেই জানুয়ারিতে ১৫২, ফেব্রুয়ারিতে ১২২, মার্চে ১৫৯, এপ্রিলে ১২৩, মে-তে ১৩৯, জুনে ১৩৭, জুলাইতে ১২৮, অগাস্টে ৩৩৬টি শিশু মারা গেছে। একটি মাত্র সরকারি হাসপাতালেই শিশু মারা গেছে গত ৮ মাসে ১২৯৬টি। সংলগ্ন ফারুকাবাদ জেলা হাসপাতালেও অগাস্ট ২০১৭ তে ৪৯ টি শিশু মারা গেছে। গোরক্ষপুর বি আর ডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই অগাস্ট ২০১৭ তে বি আর ডি মেডিকেল কলেজের আই সি সি ইউ বিভাগে ২১৩ টি শিশু এবং এনসেফালাইটিস ওয়ার্ডে ৮৩টি শিশু মারা গেছে। গত ৮ মাসে উত্তর প্রদেশের এই একটি জেলাতেই প্রায় দেড় হাজার শিশু মারা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের অভাবে বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডাঃ রাজীব মিশ্র এবং তার স্ত্রী ডাঃ পূর্ণিমা শুক্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অক্সিজেন সরবরাহকারী সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় জনমানসে আলোড়ণ সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় উদ্ধত্যের সাথে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গত ৩০শে অগাস্ট এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন "সব দায়িত্ব সরকার নেবে নাকি? এরপর তো এক-দুই বছর বয়স হলে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের ছেড়ে দেবে। বলবে সরকারই এদের দেখভাল করুক!" বি আর ডি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পি কে সিং এই মৃত্যু মিছিলের জন্য সরকারের দায় এড়াতে গিয়ে বলেছেন "মায়েদের অপুষ্টি এবং সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় সময়ের আগেই শিশুদের জন্ম হয়। অপুষ্টি, ডন্ডিস, নিউমোনিয়া, সংক্রামিত অসুখ এবং এনসেফালাইটিস নিয়ে অধিকাংশ সময়ে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর পরিণতিতেই এত মৃত্যু।"

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এবং হাসপাতাল প্রিন্সিপালের বক্তব্য কি প্রমাণ করে? প্রথমতঃ এই রাষ্ট্র জনগণের চিকিৎসার দায় অগ্রাহ্য করছে। পরিবারের লোকেদের পকেটের জোরেই চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এদেশে এত শিশু মৃত্যুর কারণ ব্যাপক জনসাধারণের অপুষ্টি এবং শ্রমজীবী জনতার জন্য গ্রাম/শহরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র,, ব্লক-মহকুমা স্তরের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার দশা কতখানি বেহাল!এক্ষেত্রে বি আর ডি হাসপাতালের ডঃ কাফিন ব্যক্তিগত উদ্যোগে, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে প্রাইভেট সংস্থা থেকে অক্সিজেন আনিয়েছিলেন শিশুদের বাঁচানোর জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই কাজের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করে এবং শিশু মৃত্যুর জন্য তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

শুধু উত্তরপ্রদেশ নয় সারা দেশে একই ছবি। Annual Report on Vital Statistics of India রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১৩ সালে দেশে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ১ বছরের কম বয়সী শিশু মারা গেছে। এই মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ মহারাষ্ট্রে (২২১৫৯ জন), দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ (১৮৯৯২), তৃতীয় স্থানে উত্তর প্রদেশ (১৮৭৬০) ইত্যাদি। দেশে গড়ে জন্মকালীন সময়ে প্রতি হাজারে ২৩০ জন শিশু মারা যায়। দেশে সমস্ত শিশুর চিকিৎসার জন্য মোট ব্যয়ের মাত্র ৩২.৪% ব্যয় করে রাষ্ট্র। ■

বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানীদের আন্দোলন

চলতি বছরের ২২শে এপ্রিল, 'বসুন্ধরা দিবসে' লন্ডন, ওয়াশিংটন, জার্মানি, স্পেনের মাদ্রিদ, বার্সিলোনা থেকে গ্রীনল্যান্ড বিশ্বের ৬০০ টির বেশি শহরে বিজ্ঞানীরা রাস্তায় নেমেছেন – রাজনীতি ও কর্পোরেট সাম্রাজ্যের কব্জা থেকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের গবেষণাকে বাঁচাতে। তাদের দাবী ছিল – রাজনৈতিক স্বার্থে একপেশে তথ্যের একচেটিয়া প্রচারের বদলে বিজ্ঞানের বিকল্প তথ্যগুলিও প্রচার করার সুযোগ করে দিতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থানও করতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে। কারণ গবেষণা ছাড়া কোন তথ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উপনীত হতে পারে না। ■

গ্লোবাল ওয়ামিং ঃ একটি কর্পোরেট প্রচার

বিশ্ব উষ্ণায়ণের আলোচনা-সমালোচনায় বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্ব উত্তপ্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী ও পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে "মিলানকোভিচ" চক্রকে প্রমাণিত করেছেন। এই "মিলানকোভিচ" চক্রই বিশ্বকে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল করে। "মিলানকোভিচ" চক্রের উপর মানব সভ্যতা কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি এবং "মিলানকোভিচ" চক্র মানব সমাজের কৃতকর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সুতরাং বিশ্ব উষ্ণায়ণ বা শীতলায়ন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

রাষ্ট্র সংঘের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দাতা সংস্থা IPCC দ্বারা

প্রচারিত – বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি – যার ফলে গ্রীণ হাউস এফেক্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ IPCC -র পক্ষধর এবং বিরোধী বিজ্ঞানী মহল উভয় পক্ষই এই বিষয়ে একমত যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব এবং জীব জগত টিকে থাকার জন্য গ্রীন হাউস এফেক্টই প্রধানভাবে দায়ী। রাষ্ট্র সংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির ৫০টি ১৯৯৪ সালে এক চুক্তিতে সম্মতি দেয় যে পুর্ণনবীকরণ যোগ্য নয় এমন শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার হ্রাস করা হবে। এরপর থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি এই বিষয় নিয়ে প্রতি বছর একটি করে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার অঙ্গীকার করে। এরই ২১ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের প্যারিসে – যা 'প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন' নামে খ্যাত। এই সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ যে চুক্তিতে সায় দেয় তা ছিল –

(১) ২১ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২° সেন্ট্রিগ্রেডের অনেকটা নিচে – ১.৫° সে. এর মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করা হবে।

(২) বিভিন্ন দেশ কার্বন নির্গমন কমানোর যে টার্গেট ঘোষণা করেছে তা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রিভিউ করা হবে।

(৩) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫° সেঃ বৃদ্ধি পেলে, ফলাফল কতদূর খারাপ হতে পারে সে বিষয়ে IPCC কে সবিস্তারে বিশেষ রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

(৪) গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে, কয়লার ন্যায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত হ্রাস করতে হবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর উন্নত দেশগুলি, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য করবে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তির মতন পুর্ণনবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়ানোর জন্যই এই অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(৫) এই শতকের মধ্যেই গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন ও শোষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে – যাতে মনুষ্যজনিত কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন না ঘটে।

২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার পর্বে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন কার্বন নির্গমনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রচারের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই – এটি স্রেফ কর্পোরেট প্রচার। যা ছিল আসলে 'প্যারিস জলবায়ু' চুক্তির বিরোধিতা। ক্ষমতায় আসার পর এই বিরোধিতার পদক্ষেপগুলি তিনি ধারাবাহিকভাবে নিয়েছেন এবং ২০১৬ সালে COP এর ২২ তম সম্মেলনে উপস্থিত হন নি। "মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন" – এই আওয়াজকে সামনে রেখে এবছর (২০১৭) ১লা জুন 'প্যারিস জলবায়ু' চুক্তি থেকে আমেরিকাকে বের করে আনেন সে দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প যে যুক্তিগুলি রেখেছেন তার মধ্যে প্রধানগুলি হলো –

(১) কয়লা নির্ভর শিল্পে আমেরিকার কর্মসংস্থান কমবে। চাকরি এ দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাবে।

(২) শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রটি এই চুক্তির ফলে আমেরিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাতে আমেরিকা বিপুল সম্পদ হারাবে।

(৩) ১ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুর্ণনবীকরণ যোগ্য শক্তির সাহায্যে দেশের চাহিদা পূরণ সম্ভব। কিন্তু ৩-৪ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভবনা যে ক্ষেত্রে রয়েছে, সেখানে সব ধরনের শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

(৪) সবুজ জলবায়ু তহবিলের জন্য আমেরিকাকে বিপুল টাকা দিতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। আমেরিকা এখন যে আর্থিক সাহায্য দেয়, তার বোঝা আরও বাড়বে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতাদের প্রতিক্রিয়া –

(১) ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী – "প্যারিস চুক্তির অনেক আগে থেকে পরিবেশকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি আমরা। প্যারিস বা নো প্যারিস, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যই জলবায়ু সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া দরকার।"

(২) ফরাসি প্রেসিডেন্ট, এমান্যুয়েল ম্যাক্রন – "নিজের দেশ তো বটেই, গোটা পৃথিবীর স্বার্থে ঐতিহাসিক ভুল করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে আমরা লড়াই থেকে সরে আসব না।"

(৩) রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট, ভ্লাদিমির পুতিন – "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্যই রাশিয়ায় গ্রীষ্মের আবহারওয়া এত খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

(৪) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী, থেরেসা মে – "প্যারিস চুক্তি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৃটেন। আমেরিকার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক।..."

(৫) জার্মান চ্যান্সেলর, অ্যাঞ্জেলা মার্কেল – "মার্কিন সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। পৃথিবীকে রক্ষা করতে আমাদের এখন আগের থেকে বেশি সক্রিয় হতে হবে।

(৬) প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, বারাক ওবামা – "যে দেশগুলি প্যারিস চুক্তিতে যুক্ত থাকবে, তারা কর্মসংস্থান ও নয়া শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই চুক্তির পক্ষে থাকা উচিত। আমেরিকা নেতৃত্ব না দিলে, এই প্রশাসন চুক্তি বাতিল করলেও, আমি আশা করি, আমাদের রাজ্য, শহর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই গ্রহের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে"।

বর্তমানের ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতন, আজ থেকে ২০ বছর আগে জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বে আমেরিকা কিয়োটো প্রোটোকল

থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ (প্রাকৃতিক) রক্ষা, বিশ্ব উষ্ণায়ণ – এর মতন বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতাদের বক্তব্য ও ভূমিকা অর্থাৎ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ বা বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য মানুষের ভূমিকা হ্রাস করার জন্য সে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচী ও চুক্তি গ্রহণ এবং লঙ্ঘন করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এসব আসলে শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণকারী বিবদমান দুই গোষ্ঠী – জীবাশ্ম জ্বালানি গোষ্ঠী ও বিকল্প শক্তির উৎস সবুজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাজার দখলের ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি মাত্র। ■

সৌর অভিযানে নাসার মহাকাশ যান

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ২০১৮ সালের জুলাই-অগাস্ট মাসে, সূর্যকে প্রদক্ষিণরত এযাবৎ পাঠান কৃত্রিম মহাকাশ যানগুলি অপেক্ষা সূর্যের আরও নিকটবর্তী কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য এক রোবোটিক মহাকাশ যান পাঠাতে চলেছে। নাসার ঘোষণায় বলা হয়েছে সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধকেও টপকে যাবে এই মহাকাশ যান। সূর্য থেকে ৪০ লক্ষ মাইল বা ৬০ লক্ষ কিমি দূরত্ব বজায় রেখে তা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। সোলার ফিজিক্সের গবেষক **ইউজিন পার্কার**, যিনি ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম সোলার উইন্ডের কথা বলেছিলেন, তার নাম অনুসারে এই মহাকাশ যানটির নাম রাখা হয়েছে, **"পার্কার সোলার প্রোব"**। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে বাজেটে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়েছে। নাসা জানিয়েছে যে এই "পার্কার সোলার প্রোব" টির ১৪০০° সেঃ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা আছে এবং এটি ৬ থেকে ১১ বছর ধরে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবে, মহাকাশের আবহাওয়া বুঝতে নানা তথ্য পাঠাবে, সৌর ঝড়ের পূর্বাভাস দেবে। ফলে সৌর ঝড়ের কারণে মহাকাশ থেকে তথ্য পাঠানোর কাজ মাঝে মধ্যেই যে ব্যাহত হয় তার সমাধান সহজ হবে।

এবছর ৫ই মে নাসার আর্থিক সহায়তায় তৈরী "রাইজ" [দ্য র‍্যাপিড অ্যাকিউজিশন ইমেজিং স্পেক্টোগ্রাফ এক্সপেরিমেন্ট] এর সফল উৎক্ষেপন সম্ভব হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩২০ কিমি উচ্চতার কক্ষপথে অবস্থিত মহাকাশযানটি প্রতি পাঁচ মিনিটে সূর্যের দেড় হাজার ছবি তুলতে সক্ষম বলে নাসার দাবি। এই ছবিগুলি থেকে সূর্যের বিভিন্ন অংশের বিকিরণের তীব্রতা, চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তির তারতম্যের বিষয়ে অনুমান করা যাবে। ইতিপূর্বে নাসার পাঠানো সোলার ডায়নামিক অবজারভেটরি (এস ডি ও) এবং সোলার টেরেস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অবজারভেটারি সূর্যকে নিয়ে গবেষণা করে চলেছে। কিন্তু সূর্যের কিছু জায়গায় দ্রুত পরিবর্তনের কারণ বুঝে উঠতে না পারায়, তা সঠিকভাবে বোঝার জন্যই "রাইজ" কে পাঠান হয়েছে। ■

পৃথিবীর দেড়গুণ বড় গ্রহের খোঁজ

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর দেড়গুণ বড় এক গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, পৃথিবী থেকে মাত্র ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে। "জিজে ১১৩২" নামে একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করায় এর নাম দেওয়া হয়েছে "জিজে ১১৩২ বি"। টেলিস্কোপের তথ্য অনুযায়ী এই গ্রহটির চারিপাশে বায়ুমন্ডলের স্তর আছে, ফলে গ্রহটি কিছু আলো শুষে নেয়। টেলিস্কোপের তথ্যকে কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের অনুমান যে এই গ্রহে জল ও মিথেন থাকতে পারে। ■

প্রায় পৃথিবীর আকৃতির নতুন সাত গ্রহের সন্ধান

সাত সাতটা গ্রহ এক সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা দিল ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। বেলজিয়ামের Lige বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী **Michael Gillon** ও তার অনুগামীরা ২০১৫ সালে চিলিতে বসানো, "ট্রাপিস্ট" টেলিস্কোপ (ট্রানজিটিং প্ল্যানেটস অ্যান্ড প্ল্যানেটিসিয়্যালস স্মল টেলিস্কোপ) পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে, 'অ্যাকোয়ারিয়াস' নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বামন নক্ষত্রের সন্ধান পান। নক্ষত্রটির আয়তন সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট এবং বিকিরণও অনেক কম। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে নক্ষত্রটি থেকে বিকিরিত আলোর পরিমাণ কখনো কমছে, কখনো বাড়ছে। কিন্তু কেন? তারা চিলির "ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ" বা "ভি এল টি"র সাহায্যে দেখতে পান যে নক্ষত্রটির আলো বিকিরণ কমা-বাড়ার কারণ হলো – ঐ নক্ষত্রটিকে ঘিরে খুব কাছ থেকে প্রায় পৃথিবীর আকৃতির তিনটি গ্রহ ঘুরছে। আরও লক্ষ্য করেন যে গ্রহ তিনটি রয়েছে, "গোল্ডিলকস জোন" বা "হ্যাবিটেবল জোন" এ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় গোল্ডিলকস জোন হল সেই দূরত্ব, কোন নক্ষত্র থেকে কোন গ্রহ যে দূরত্বে থাকলে ঐ গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের পরিবেশ পাওয়া সম্ভব। এই আবিষ্কার সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যায় বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার দেবেন্দ্র কে সাহুর নেতৃত্বে, চিলির প্রায় উল্টোদিকের দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ভারতের লাদাখে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় বসানো "হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ"-এর সাহায্যে "ট্র্যাপিস্ট-১" নক্ষত্র মন্ডলের গ্রহ তিনটিকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক দেবেন্দ্র সাহুর বিশেষ বিষয়টি হলো যে তিনি নিশ্চিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন ঐ গ্রহ তিনটির অর্বিট্যাল পিরিয়ড আদৌ ৩.০২ পার্থিব দিন নয়

তা আসলে ১.৫১ পার্থিব দিন। ২০১৬ সালের ১লা মে বিজ্ঞানী গিলান ও তার সহযোগী গবেষকদের গবেষণা পত্রের সঙ্গে অধ্যাপক সাহুর গবেষণা পত্রটিও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল "নেচার"-এ প্রকাশিত হয়।গ্রহ তিনটির নাম রাখা হয়, 'ট্রাপিস্ট-১বি', 'ট্রাপিস্ট-১সি', 'ট্রাপিস্ট-১ডি'। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাসার স্পিৎজার, স্পেস টেলিস্কোপে, 'ট্রাপিস্ট-১' নক্ষত্রটির আরও চারটি গ্রহের – 'ট্রাপিস্ট-১ই', 'ট্রাপিস্ট-১এফ', 'ট্রাপিস্ট-১জি' এবং 'ট্রাপিস্ট-১এইচ' – এর সন্ধান পায়।

সম্প্রতি নাসা এবিষয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ■

পালসার-এর সন্ধান

"যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে" – এ বক্তব্য বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি বস্তুর জন্য সত্য। আকাশের নক্ষত্রদেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে নক্ষত্ররা হয় "ব্ল্যাক হোল"-এ পরিণত হয়, আর নয় তো নিউট্রন স্টারে পরিণত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই নিউট্রন স্টারকেই পালসার বলা হয়। পালসারের চারিপাশে অসম্ভব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে। পালসার থেকে আলোর বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে।

সম্প্রতি 'নেচার অ্যাস্ট্রোনমি' জার্নালে সাউথ আফ্রিকান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অবজার্ভেটারির জ্যোর্তিবিজ্ঞানী**ডেভিড বাকলে** ও ওয়ার উইক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে – চলতি বছরের গোড়ায় ব্রহ্মান্ডে প্রথম 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, পৃথিবী থেকে ৩৮০ আলোকবর্ষ দূরে, স্করপিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জে। এর নাম "এ আর স্করপি"। ১৯৬৭ সালে প্রথম পালসার আবিষ্কারের পরে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার' এর যে ধারণা ছিল তা এত দিনে বাস্তবায়িত হলো। যে সাদা বামন নক্ষত্রটি থেকে এই পালসারটির জন্ম তা আয়তনে পৃথিবীর মত হলেও ভরে পৃথিবীর ভরের ২ লক্ষ গুণেরও বেশি।

এ বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল, "সায়েন্স" এ প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে যে নাসার নিউস্টার টেলিস্কোপে এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (এ সা) "এক্স এম এম নিউট্রন" উপগ্রহে – ব্রহ্মান্ডের এ যাবৎ প্রাপ্ত পালসারদের মধ্যে উজ্জ্বলতম পালসারের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। পৃথিবীর থেকে ৫০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই পালসারটির নাম – "এন জি সি-৫৯০৭-ইউ এল এক্স"। 'এসা'র উপগ্রহের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে আরও একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল "অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স" এ। সদ্য আবিষ্কৃত উজ্জ্বলতম পালসারটি পূর্বের উজ্জ্বলতম পালসার "এম-৮২ এক্স-২" অপেক্ষা ১০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। ■

ফিরে পাওয়া

ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান-১, ২০০৯ সালের ৯ই অগাস্ট থেকে নিখোঁজ। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না নাসার পাঠানো লুনার-রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এল আর ও) এরও। নাসার পক্ষে পাসাডেনায় নাসার জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরির (জে পি এল) রাডার বিশেষজ্ঞ মারিনা ব্রোঝোভিক সম্প্রতি জানিয়েছেন যে পৃথিবীতে বসানো টেলিস্কোপের মাধ্যমেই উভয়কেই চাঁদের কক্ষপথে খুঁজে পাওয়া গেছে। এতদিন চাঁদের পৃষ্ঠতলের প্রতিফলিত আলোর উজ্জ্বলতার জন্যই কোনো অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের কক্ষপথে ঐ দুই মহাকাশ যানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্যালির্ফোনিয়ায় গোল্ডস্টোন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন কমপ্লেক্সে বসানো ৭০ মিটার লম্বা একটি অ্যান্টেনা টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁজে পাওয়া গেছে "চন্দ্রযান-১" কে। এই টেলিস্কোপটি একেবারেই নতুন প্রযুক্তির। ■

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহের সংঘর্ষ এড়ালেন বিজ্ঞানীরা

মঙ্গল গ্রহকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতেই প্রদক্ষিণ করছিল তার প্রাকৃতিক উপগ্রহ "ফোবস"। কিন্তু ভুল হয়ে গিয়েছিল নাসার পাঠান মঙ্গল গ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহ "মাভেন" এর কম্পিউটার ও পাসাডেনায় নাসার হেড প্রপালসান ল্যাবরেটরির গ্রাউন্ড কন্ট্রোল রুমের অভ্যন্তরীণ ও রিমোর্ট কন্ট্রোল সিস্টেমে। এ বছর ৩রা মার্চ পাসাডেনায় নাসার এই কন্ট্রোল রুমের বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেন যে "ফোবস" ও "মাভেন" ৬ই মার্চ মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়তে চলেছে। বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে "মাভেন" এর বেগ সেকেন্ডে ১/২ মিটার বাড়িয়ে দেন। "মাভেনে"র এই বেগ বৃদ্ধির ফলে ৬ই মার্চ "মাভেন" ও "ফোবস" এর মহাকাশ দূরত্ব দাঁড়ায় আড়াই মিনিট, "মাভেন"র বেগ না বাড়ালে যা হতো মাত্র ৭ সেকেন্ড। যদি উভয়ের মহাকাশ দূরত্ব ৭ সেকেন্ড হতো তবে "ফোবস" এর প্রবল আকর্ষণ বলে, "মাভেন" আছড়ে পড়ত "ফোবস"-এর পৃষ্ঠে। ■

ল্যান্ড মাইনের খোঁজ দেবে জি এম ব্যাকটেরিয়া

ল্যান্ডমাইন খুঁজে নিষ্ক্রিয় করা বেশ বিপজ্জনক। ল্যান্ড মাইনের খোঁজ করতে গিয়ে প্রাণহানিও ঘটেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণাও চলছে দীর্ঘ দিন ধরে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল, "নেচার-বায়োটেকনোলজি"র সংখ্যায়

ইজরায়েলের জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক **সিমশন বেল্কিন** ও তাঁর সহযোগীদের এক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে যে অধ্যাপক সিমশন বেল্কিনের নেতৃত্বে এক বিশেষ ধরনের জেনিটিক্যালি মডিফায়েড ব্যাকটেরিয়া বানান সম্ভব হয়েছে যারা ল্যান্ড-মাইনের সন্ধান দিতে পারে। ল্যান্ড মাইন বানান হয় সাধারণ কোন পলিমার যৌগ দ্বারা। এই পলিমার যৌগের বাষ্পের গন্ধে ঐ জি এম ব্যাকটেরিয়া জোনাকির মত ফ্লুরোসেন্ট আলো বিকিরণ করে। পলিমার যৌগের বাষ্পায়নের হার যত বাড়ে, ঐ জি এম ব্যাকটেরিয়া থেকে আলোর বিকিরণও তত বাড়ে। তিন বছর আগে বেল্কিন ও তাঁর সহযোগীরা এই ধরনের জেনিটিক্যালি মডিফায়েড ফ্লুরোসেন্ট ব্যাকটেরিয়া দিয়েই জলের মধ্যে জীবাণু বা দূষণ সৃষ্টিকারী কণা খুঁজে বের করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন। ■

বিগ ব্যাং-এর পরবর্তী ধাপ

ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ। ব্রহ্মান্ডের পদার্থগুলি অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা প্রোটন এবং আধানহীন কণা নিউট্রন। এই প্রোটন ও নিউট্রনগুলি গঠিত হয়েছে কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্কের সমন্বয়ে। জানা গেছে যে ছয় ধরনের কোয়ার্ক আছে। এরা হলো – আপ, ডাউন, টপ, বটম, চার্ম ও স্ট্রেঞ্জ। এই কোয়ার্কগুলি নিজেরা এবং কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্কগুলি গ্লুওন কণা দ্বারা শক্তিশালী বলে আবদ্ধ থাকে। প্রতিটি প্রোটন কণা দুটি আপ ও একটি ডাউন কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। প্রোটনের মধ্যে এই আপ ও ডাউন কোয়ার্কগুলি – আরও ক্ষুদ্র গ্লুওন কণা দ্বারা অতি শক্তিশালী বলের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এনার্জি ডেনসিটি" কম থাকলে কোয়ার্ক, অ্যান্টিকোয়ার্ক ও গ্লুওন কণাগুলিকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু "এনার্জি ডেনসিটি" যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে কোয়ার্ক, অ্যান্টিকোয়ার্ক ও গ্লুওন কণাগুলি তাদের মধ্যকার দৃঢ় বন্ধন ভেঙ্গে একটি স্যুপ তৈরী হয় – যাকে বলা হয়, "কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা"। যা আসলে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রায় কোনো পদার্থের অত্যন্ত গরম ও ঘন অবস্থা।

সম্প্রতি সার্নের লার্জ হ্যাড্রান কোলাইডারের (LHC) "অ্যালিস" লাবরেটরীতে ৭ টেরা ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিতে প্রোটন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে পদার্থের এই অদ্ভুদ অবস্থাটা চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই অবস্থায় স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক কণাকেও চিহ্নিত করা গেছে।

ব্রক্ষান্ড সৃষ্টির পূর্বে মহা বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) ধারণা বিজ্ঞানীরা করেন, এই বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচন্ড তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল তা ১ সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই নেমে যাওয়ার কারণ বিজ্ঞানীদের অভিমত তখন প্রচন্ড গতিতে এবং অসম্ভব দ্রুতহারে ফুলে-ফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল ব্রক্ষান্ড – যাকে বলে "ইনফ্লেশন"। এই সময়ই কোয়ার্ক, অ্যান্টিকোয়ার্ক ও গ্লুওন এর মতন কণাগুলির জন্ম হতে শুরু করে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান ছিল। "অ্যালিস" ল্যাবরেটরীতে প্রোটন কণার মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তেমনই এক দশা চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ■

বায়ু থেকে জল সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল, "সায়েন্স"-এ চলতি বছরের ১৩ই এপ্রিল সংখ্যায়, "ওয়াটার হারভেস্টিং ফ্রম এয়ার উইথ মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস পাওয়ার্ড বাই ন্যাচেরাল সানলাইট" শিরোনামে এক যন্ত্র উদ্ভাবনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ইভলিন ওয়ার্ক ও বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ ওমর ইয়াখির নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক গবেষক দল – এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। এই গবেষণা দলে দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী সমীর আর রাও এবং শঙ্কর নারায়ণন যুক্ত আছেন।

গবেষকরা জারকোনিয়াস ধাতু ও অ্যাভিপিক অ্যাসিড দিয়ে একটি জটিল যৌগ বানিয়েছেন, যার নাম 'মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' (MOF)। স্পঞ্জ জাতীয় এই জটিল যৌগটি খুব কম শক্তি ব্যায় করেই বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নিতে পারে। আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ যদি ২০% থেকে ৩০% এর মধ্যে হয় তবে ১২ ঘন্টায় ২.২ পাউন্ড ভরের 'মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' বাতাস থেকে ২.৮ লিটার জল শুষে, স্পঞ্জ জাতীয় যৌগটির ছিদ্রগুলিতে জমা করে।

আগামী দিনে এর ব্যবহারিক প্রয়োগে যেমন জলের সমস্যা কিছুটা মেটার সম্ভবনা আছে, তেমনই সম্ভবনা আছে সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশগুলির মানুষের গ্রীষ্মকালীন সময়ে জলীয় বাষ্পের দাপট থেকে ঘরের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার। ■

"ব্লাড ফলস" এর উৎস সন্ধানে

১৯৯১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভূ-বিজ্ঞানী **গ্রিফিথ টেলার**, আন্টার্কটিকার ম্যাক মারডো শুষ্ক উপত্যকায় একটি জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। জলপ্রপাতটি থেকে নির্গত জলের বর্ণ লাল হওয়ায় এর নাম দেওয়া হয় 'ব্লাড ফলস'। কিন্তু তীব্র ঠান্ডার মধ্যে কিভাবে এই জলপ্রপাতটির উদ্ভব হলো এবং এর জলের

বর্ণ লাল হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন ছিল। গবেষণাও চলছিল।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ আলাস্কা ও কলোরাডো কলেজের একদল গবেষক, 'ব্লাড ফলস' এর উৎসস্থল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গবেষকদের দাবি – জলপ্রপাতটির মূল উৎস একটি নোনা জলের হ্রদ যা ৫০ লক্ষ বছর ধরে টেলর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে আছে। বিজ্ঞানীরা 'রেডিও-ইকো-সাউন্ডিং' প্রযুক্তির সাহায্যে টেলর হিমবাহের নিচে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠিয়ে যে সিগন্যাল পেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে হিমবাহের নিচে তরল অবস্থায় আছে একটি বিশাল হ্রদ। হিমবাহ বিজ্ঞানী **এরিন পেতিতের** মতে, টেলর হিমবাহ সৃষ্টির সময় যে তাপ ছেড়েছে সেই তাপই হ্রদের নোনা জলকে জমতে দেয় নি। শীত প্রধান দেশে শীতকালীন আবহাওয়ায় নদী বা হ্রদের (জলাশয়ের) উপরের জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। আর বরফে পরিণত হওয়ার সময় যে তাপ ছাড়ে তাতেই নিচের জল তরল অবস্থায় থেকে যায়, ফলে জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা "ব্লাড ফলসে"র বিষয়ে আরও জানিয়েছেন যে হ্রদের জল লৌহ সমৃদ্ধ হওয়ায় ঐ জল বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে লাল বর্ণ ধারণ করছে। আর এই কারণেই টেলর হিমবাহের গায়ে রক্ত বর্ণের ছাপ দেখা যাচ্ছে। ■

এভারেস্ট প্রসঙ্গে

২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার) কিছুটা বসে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এর স্বপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান জার্নালে বেশ কিছু তত্ত্বগত হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হয়েছে। এভারেস্টে ওঠার বেস ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ওয়ানে যাওয়ার পথে খুম্বু আইসকলে ফাটলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এভারেস্ট শৃঙ্গের বেশ কিছুট নিচে, দক্ষিণ-পূর্ব গা ঘেঁষে প্রায় ১২ মিটারে বড় পাথুরে অংশ পাহাড়ের গা থেকে বেড়িয়ে ছিল – যা "হিলারি স্টেপ" নামে পরিচিত। এই "হিলারি স্টেপ" নিশ্চিহ্ন হওয়ার অনুমান করেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীদের অনুমানের সত্যতা যাচাই করতে জরুরী হয়ে পড়ে পুণরায় এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা মাপা এবং "হিলারি স্টেপ"র অনুসন্ধান করা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, "সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার" সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট এর নেতৃত্বে প্রথম তাত্ত্বিক ভাবে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা মাপা হয়। সে সময় এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা মাপার প্রধান তাত্ত্বিক কাজটি করেন রাধানাথ শিকদার। দ্বিতীয়বার ১৯৫৬ সালে, 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' দায়িত্বে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা মাপা হয়। এবার উচ্চতা মাপতে 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' নেপালের সঙ্গে এক যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এবছর এই লক্ষ্যে প্রথম অভিযানটি শুরু হয় ১৬ই মে, অভিযাত্রী দলের নেতা টিম মোসডেল, "হিলারি স্টেপ' নিশ্চিহ্ন হওয়ার অনুমানটি নিশ্চিত করেছেন। ২০১৬ সালে ঐ অংশে এত বেশি বরফ জমে ছিল যে, 'হিলারি স্টেপে'র অস্তিত্বের বিষয়ে কিছুই বোঝা যায় নি। ■

প্রজাতির সন্ধানে

উভচর প্রাণীর দেহে অবস্থিত বায়োকেমিক্যাল ফ্লোরিসিয়া গবেষণার জন্য একদল হারপেটোলজিস্ট ব্যাঙ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন আর্জেন্তিনার সান্তাকে শহরের সীমান্তে। ব্যাঙ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করে **হাইপসিবোয়াস পাঙ্কাটাটাস** প্রজাতির ব্যাঙ। এরা, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ জঙ্গলে যে উজ্জ্বল বর্ণের বিষধর ব্যাঙ পাওয়া যায় তাদের থেকেও উজ্জ্বল। দিনের আলোর সঙ্গে ব্যাস্তনুপাতে এদের উজ্জ্বলতা পরিবর্তিত হয়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে "পোলকা-ডট-টি"। যে ১০০টি ব্যাঙ সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের সবার গায়ে রয়েছে "ফ্লুরোসেন্ট" এবং ছোটো ছোটো লাল বর্ণের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ছোপ।

২০১৪ সাল থেকে স্বাদু জলের কাঁকড়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন ভারতের কেরলের কয়েকজন গবেষক। কেরলের কানি উপজাতির লোকদের কাছে এই প্রজাতির কাঁকড়া সম্পর্কে জেনে, এদের খোঁজ শুরু করা হয়। অবশেষে গাছের উপরে লম্বা লম্বা দাঁড় যুক্ত আর্বোরিয়াল প্রজাতির এই কাঁকড়ার সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা।

১৯৩৬ সালে, হোবার্ট চিড়িয়াখানায় শেষ "থাইলাসিন" প্রজাতির বাঘটির মৃত্যু হয়। এদের দেখতে কিছুটা কুকুরের মতন, কিছুটা শেয়ালের মতন। এরপর থেকে গত ৮০ বছরে পৃথিবীর কোন প্রান্তেই "থাইলাসিন" প্রজাতির বাঘ দেখা যায় নি। তাসমানিয়ায়, আট দশক পূর্বে এদের বিক্ষিপ্তভাবে দেখা গেলেও, অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখন্ড থেকে এরা প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এ বছর কুইন্সল্যান্ডে ঐ বিলুপ্ত প্রজাতির বাঘের হঠাৎ করে দেখা পাওয়া যায়। জেমস্ কুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই প্রজাতির বাঘের সন্ধানে নেমে পড়েন এবং এই প্রজাতির চারটি বাঘের সন্ধান পান। ■

জীবাশ্মের সন্ধানে

সম্প্রতি, সুইডিশ মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির গবেষক **থেরেস সল সন্টেড** ও তাঁর সহযোগী গবেষক **স্টেফান বেঙ্গট্সন** এর একটি গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল, "পলস বায়োলজি" তে প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে

যে মধ্য ভারতে সদ্য হদিশ মেলা প্রাচীনতম শিলার খাঁজে খাঁজে শৈবালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। শিলার বয়স মেপে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে লাল বর্ণের ঐ বিশেষ প্রজাতির শৈবালের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে কমপক্ষে ১৬০ কোটি বছর পূর্বে। ইতিপূর্বে বাল্টিক সাগরে যে প্রাচীন শৈবালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা আজ থেকে ১২০ কোটি বছর পূর্বে জন্মে ছিল। সুতরাং **এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত উদ্ভিদ জীবাশ্মদের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম**। অধ্যাপক স্টেফান বেঙ্গট্সন জানিয়েছেন যে প্রাচীনতম এই শৈবালের কোনো ডি এন এ না পাওয়ার ফলে তাদের শরীরের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে জানা যায় নি।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল "নেচার" এ ৪২৮ কোটি বছর পূর্বের অণুজীবের জীবাশ্ম পাওয়ার খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। পাথরে খাঁজে স্ট্রয়ের যত আকারের ঐ অণুজীবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে উত্তর-পূর্ব কানাডার নুভভুয়াগিত্তিক এলাকায় (হাডসন উপসাগর)। এ বিষয়ে প্রধান গবেষক লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের বায়োকেমিস্ট ডড ম্যাথুর মতে, পৃথিবী সৃষ্টির (৪৬০ কোটি বছর) কিছু পরেই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল অণুজীবদের – এই মতকেই আরও জোড়াল করল ৪২৮ কোটি বছর পূর্বের অণুজীবদের এই জীবাশ্ম। যদিও বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, যার ভিত্তিতে অণুজীবের এই জীবাশ্মটিকে প্রাচীনতম বলা হচ্ছে, তা সঠিক নাও হতে পারে। কারণ যে শিলাস্তরে এই আদিমতম অণুজীবদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার বয়স নিয়েই সন্দেহ আছে। যদিও গবেষক ডড ম্যাথুর মতে যে জায়গায় জীবাশ্মটি পাওয়া গেছে সুদূর অতীতে ঐ জায়গাটি ছিল সমুদ্রগর্ভে। সুতরাং শিলা গঠনের প্রাকৃতিক নিয়ম এবং রাসায়নিক বিবর্তনের সূচনার ইতিহাস অনুযায়ী এটা সম্ভব।

হিমাচল প্রদেশে, শিবালিক পর্বতমালা অঞ্চলে সিমলা থেকে কাঙ্গরার দিকে যেতে ১২০ কিমি দূরে হরিতালঙ্গরে খনন কার্যের ফলে, প্রাচীন ape এর পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ৭ মিলিয়ন বছরের পুরানো এই জীবাশ্মগুলির দুধের দাঁত অপসারিত হয় নি, নিচের চোয়ালের গঠন সম্পূর্ণ হয় নি, মোলার দাঁতগুলি শীর্ষদেশ তৈরী হলেও মূল তৈরী হয় নি – এই সব কিছু থেকেই অনুমান করা হয়েছে জীবাশ্মগুলি শিশুদের। বর্তমানে হিমালয় ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যে Siamang Gibbon পাওয়া যায় এরা আকারে তাদের চেয়ে কিছুটা বড়। জীবাশ্মগুলি নিয়ে পরবর্তী গবেষণায় অনুমান করা হয় যে নমুনাগুলি প্রাচীন ape এর পূর্বপুরুষ Pliopethecoid এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ – যারা মায়োসিন যুগে ইউরেশিয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মজার বিষয় হলো ১৯৭০ সালে এ অঞ্চলে যে ape এর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল তার তৃতীয় মোলার দাঁতের সঙ্গে আধুনা প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলির তৃতীয় মোলা দাঁতের আকার ও গঠন সঙ্গতিপূর্ণ থাকায় অনুমান করা হয় যে সম্ভবত এরাও Pliopethecoid গণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেসময় ঐ মোলার দাঁত এতটাই ক্ষয় প্রাপ্ত ছিল যে যথার্থ গবেষণা সম্ভব হয় নি, প্রাথমিকভাবে ঐ নমুনাকে Pliopethecus krishnaic ভাবা হলেও, বর্তমানে একে এক নতুন গণ Krishna pithecus রূপে চিহ্নিত করা হয়।

Anthropological Survey of India এর অবসর প্রাপ্ত নৃ-বিজ্ঞানী Dr. Anekh. R. Sankhgan, Arizona State University এর Institute of Human Origins and School of Human Evolution and Social Change এর Dr Joy Kelley এবং New York University এর Center for the Study of Human Origin in the Department of Anthopology এর Terry Harrison এর এই গবেষণার খবর বিজ্ঞান জার্নাল Current Science এ প্রকাশিত হয়েছে।

Sankhyan ১৯৮৫ সালে এই অঞ্চল থেকেই Hominid এর পরবর্তী পর্যায়ের এক জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছিলেন যা ছিল Sivapithecus। বর্তমানও সেই সময়কার জীবাশ্মগুলিকে ভিত্তি করে তিনি বলেছেন যে মায়োসিন যুগে Haritalayangar সম্ভবত Hominid দের আশ্রয়স্থল ছিল। ■

এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ

বেলজিয়াম সরকারের সহযোগিতায় ভারত সরকার নৈনিতালের প্রায় ৬০ কিমি উত্তর-পূর্বে পাহাড়ের চূড়ায় বসানো এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপটি চলতি বছরের ২রা এপ্রিল রাতে ব্রহ্মান্ডের নজরদারি শুরু করে। এই অপটিক্যাল টেলিস্কোপটির লেন্সের ব্যাস ৩.৬ মিটার যা মহাকাশে বসান হ্যাবল স্পেস টেলিস্কোপের চেয়েও বেশি। ২০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে বেলজিয়াম দিয়েছে ২০ লক্ষ ইউরো। টেলিস্কোপটি দেখভালের দায়িত্ব নৈনিতালের, "আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ অবজারভেশনাল সায়েন্স" (এরিজ) এর ওপর আরোপিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তের যে কোন মহাজাগতিক বস্তুর ক্ষীণতম "সিগন্যাল" বিশ্লেষণ করে এবার একেবারে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ■

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যেই গণহারে শিশুহত্যা

২০১৪ সালে আয়ারল্যান্ডের এক গবেষক ক্যাথরিন করলেস টুয়াম শহরে এক গণ কবরের চাঞ্চল্যকর খবরটি প্রকাশ করেন। ক্যাথরিন তার গবেষণা পত্রে দাবি করেছিলেন যে অবিবাহিত অন্তঃসত্বা মহিলারা থাকতে আসতেন পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের

খোলা জানালা ঃ

‘মঠ-মিশন-এন জি ও-দের দান-ধ্যান মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে’

– পঞ্চানন মন্ডল

দান-ধ্যান, কাঙ্গালী ভোজন, কম্বল বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা শিবির এগুলো নিঃসন্দেহে ভালো কাজ, করাও উচিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ এই ধরনের বুভুক্ষু মানুষ আছেন। আমি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এই উপায়ে কি তাদের দুঃখ মোচন করতে পারবো? এখন বিশ্বে অতিউৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে এই বিশ্বে সম্পদের অভাব নেই, সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করার মতো শক্তিরও অভাব নেই। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মানব সম্পদ। তাহলে সেই মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে, অন্য-বস্ত্র বাসস্থানহীন হয়ে জীবন কাটাবে কেন? কেন তাকে দুটো ভাত কাপড়ের আশায় পরের দয়ার প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হবে? যারা এই ধরনের সামাজিক কাজগুলো করেন (ক্লাব বা এন জি ও) তাদের কিন্তু নিজেদের কাজের পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলোও তোলা উচিত। কারণ তাদের নিশ্চয় একটা দরদী মন আছে। তবেই তো তারা পথের ধুলোয় পড়ে থাকা মানুষদের এতটা মমতা দিয়ে যত্ন করতে পারেন।

যতটা পারা যায় মানুষের কষ্টে ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত কিন্তু সেটা মানুষকে দয়ার পাত্র মনে করে নয়, এগুলো র পাশাপাশি এই স্তরের সর্বহারা মানুষদের নিজেদের প্রাপ্ত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কাজটাও করা উচিত। কারণ নাগরিক অধিকারের খেয়াল রাখাটা সিস্টেমের মাথা আর সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর এখান থেকেই সমস্যার শুরু। যতক্ষন তুমি গরীবকে ভিক্ষা দেবে দয়া করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মহান মানুষ, দেশ বিদেশ থেকে নানান পুরস্কার সম্মানও জুটে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই তুমি সেই গরীবটাকে পাশে নিয়ে প্রশ্ন তুলবে দুনিয়ায় সব মানুষ তো একইভাবে আসে আর একইভাবে যায়, তাহলে এই মানুষটা খাওয়া পড়া পাচ্ছে না কেন? এর ভাগের খাওয়া আর পোশাকটা কে নিল? অমনি দেখা যাবে পুরস্কার তো দূরের কথা, রে রে করে ডান্ডা হাতে একদল পুলিশ তোমার দিকে তেড়ে আসছে। আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন মঠ, মিশন, আশ্রম বা এন জি ও বা ক্লাব দেখিনি যেখানে গরীব মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কথা বলা হয়। উল্টে গরীবের মাথায় ঢোকানো হয় – তোমার ভাগ্যে নেই, ওপরওয়ালা তোমাকে দেয়নি, তোমার গতজন্মে পাপ ছিল তাই তুমি পাওনি, এই জাতীয় কথা। মানুষকে মনের দিক থেকে শক্তিশালী করার বদলে তাকে অদৃষ্টবাদী করে দেয় এরা। সেই জন্যেই এই ধরনের সংস্থাগুলো সিস্টেম থেকে নানা অনুদান আর সাহায্য পায়। মানুষকে লড়বার কথা প্রচার করলে অনুদান-সম্মান তো দূরের কথা উল্টে মার খেতে আর জেলে যেতে হোত।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবরের শেষাংশ ঃ

কাউন্টির টুয়ামের প্রসূতি ভবনে। সন্তান প্রসবের কিছু দিন পরে সেখান থেকে মায়েরা চলে যাওয়ার সময় কেউই নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন না। প্রসূতি ভবনের নিচেই এই সব সদ্যজাতদের গণকবর দেওয়া হতো। সে সময় আয়ারল্যান্ড সরকার ক্যাথরিনের এই বক্তব্যকে পাত্তা দেয় নি। ওয়াশিংটন পোস্টের ব্লগার টেরেন্স ম্যাকয় নিজের ব্লগে ক্যাথরিনের গবেষণার কথা প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ড সরকার এক কমিশন গঠন করেন, ক্যাথরিনের বক্তব্য যাচাই করার জন্য। গত ৩রা মার্চ কমিশন, পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের প্যালওয়ে কাউন্টির টুয়ামের প্রসূতি ভবনের নিচে খনন করে সেপটিক ট্যাঙ্ক এর মধ্যে ১৭টি কুঠুরি পান। আর ঐ কুঠুরি গুলির মধ্যেই মিলেছে অসংখ্য শিশুর কঙ্কাল। বন সেকুর সিস্টার্স নামে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যেই চলত এই প্রসূতি ভবন। গণকবরের খনন কার্যের পরে কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঙ্কালগুলি পরীক্ষা করে জানা গেছে যে কঙ্কালগুলি সব ৩৫ সপ্তাহ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুদের এবং এই গণ শিশুহত্যা ১৯২৫ থেকে ১৯৬০ এর মধ্যেই ঘটেছে। টুয়াম শহরের এই প্রসূতি ভবন বন্ধ হয় ১৯৬১ সালে। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর এই কাজে কমিশনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বন সেকুর সিস্টার্স কর্তৃপক্ষ।■

বিশেষ রচনা ঃ

বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভব ও বিকাশ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ দাবানলের উপকারি অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করেই আগুন জ্বালাতে শেখে। আগুন জ্বালাতে শেখার পর বৈষয়িক জীবনে তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় আগুনের স্থায়িত্ব দান। তৎকালীন সময়ে বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা দাহ্য শুকনো গাছপালাই ছিল আগুনকে স্থায়িত্ব দানের উপকরণ। কাঁচা খাবারের পরিবর্তে পোড়া-সিদ্ধ খাবার, হিংস্র জীবজন্তুর থেকে আত্মরক্ষা, শিকার করার কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও এই আগুনের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা ছিল, তা হ'ল রাতের অন্ধকারে অদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দৃশ্যমান করে তোলা।

কোনো বস্তুকে আমরা দেখতে পাই কেন?

কোনো আলোক উৎস থেকে আলোক কোনো বস্তুর উপর আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে রেটিনায় ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করলে, মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্র তাকে দৃশ্যমান করে তোলে। তাই কোন বস্তুকে দৃশ্যমান হতে হলে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আলোর উপস্থিতি। প্রাচীন যুগে মানব মস্তিষ্কের এই উপলব্ধি, প্রকৃতির মধ্যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এমন বস্তুর অনুসন্ধান শুরু করে যাতে তাপশক্তির তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী আলোকশক্তি পাওয়া যায়। অনুসন্ধান, আবিষ্কার, প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বেশ কিছু প্রাণীজ ও ভেষজ আলোক উৎপাদী উপাদান সংগ্রহ করে, যেমন তিমি মাছের তেল, শীল মাছের চর্বি, রেড়ির তেল ইত্যাদি। প্রদীপের ন্যায় অতি সরল আলোক উৎপাদনকারী ব্যবস্থা প্রাচীন কালে প্রায় সব দেশেই গড়ে উঠেছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় যে সভ্যতার বিকাশ আসলে সমাজে উৎপাদনের বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ। উৎপাদন বিকাশে যুগান্তকারী ঘটনা হলো বাষ্পশক্তি দ্বারা পেশীশক্তির প্রতিস্থাপন। এই উৎপাদনের বিকাশ ত্বরণ যুক্ত গতি লাভ করে যখন উৎপাদন ক্ষেত্রে বাষ্প-শক্তি, তড়িৎশক্তি দ্বারা অপসারিত হয়। তড়িৎশক্তির আবিষ্কার এবং তড়িৎশক্তি সম্পর্কিত ওহমের সূত্র, জুলের সূত্র, ফ্যারাডের সূত্র, লেঞ্জের সূত্র ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রযুক্তিগত প্রয়োগ একদিকে যেমন অভূতপূর্ব, অকল্পনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাল, অন্যদিকে তেমনই বহুক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়কে সহজ করে দিল। রাতের অন্ধকারের সময় সীমা আর গোধূলি থেকে ঊষা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন রইল না। মানব প্রজাতি তার নিজের প্রয়োজনে সে সময় সীমাকে কমাতে এবং বিচ্ছিন্ন করতে পারল।

বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের অ্যালকেমিস্ট **আল রাজি**, প্রথম Crude-minaral Oil কে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করে সরল বাতির উদ্ভাবনের কথা বলেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ চিকিৎসক, **Abraham Pinio Gesner**, আলো উৎপাদনের জন্য তিমির তেলের পরিবর্তে কয়লা থেকে বিশুদ্ধ জ্বালানি তেল উৎপাদনের সম্ভবনা ব্যাক্ত করেন এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনিই কেরসিন তেলকে আলো উৎপাদনের জন্য চিহ্নিত করেন। ঐ বছরেই ফার্মাসিস্ট **Ignacy Luca Siewiciz** প্রথম কেরসিন ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন। ইউরোপে এই কেরসিন ল্যাম্পকে Street Lamp রূপেও ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন** তড়িৎশক্তি আবিষ্কার করেন। এটা ছিল স্থির তড়িৎ। **কুলম্ব** স্থিরতড়িৎ-এর আকর্ষণ বলের সূত্র প্রতিষ্ঠা করলেও, স্থির তড়িৎ প্রায় প্রবাহ শূন্য হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ সম্ভব হয় নি।

তড়িৎশক্তিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হলো স্থায়ী তড়িৎশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা। **ভোল্টা** সৃষ্টি করলেন তড়িৎ কোশ। তড়িৎ কোশ হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে দুটি ভিন্ন ধাতুর পাত কোন রাসায়নিক দ্রবণে আংশিকভাবে নিমজ্জিত এবং ঐ তড়িৎদ্বার দুটি বাহ্যিকভাবে তড়িৎ-পরিবাহী দ্বারা কোন যন্ত্রে, বাতিতে, ফ্যানে ইত্যাদিতে যুক্ত করা যায়। এই ব্যবস্থায় রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। এরপর উচ্চ বিভবের ও উচ্চ প্রবাহমাত্রার তড়িৎশক্তি পেতে তড়িৎ কোশে ভিন্ন ধর্মী ধাতবপাত দুটি-র সংখ্যা বাড়ানো শুরু হলো। উৎপন্ন হলো ব্যাটারি – যা আসলে একাধিক তড়িৎ কোশের সমষ্টি। ব্যাটারিতে যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হল তা ছিল একমুখী প্রবাহী তড়িৎ (D.C)।

১৮০০ শতাব্দীর প্রথম দিকে **Humphry Davy** এবং **Frederick de Moleyns** চারকোল দন্ড ও ব্যাটারির সাহায্যে বৈদ্যুতিক ভাস্বর বাতি তৈরীর প্রচেষ্টা চালান। চারকোল দন্ড দুটির দূরত্ব কমিয়ে-বাড়িয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি উদ্ভাবনেরও প্রচেষ্টা চালান। বৈদ্যুতিক ভাস্বর বাতিতে [Incandesence bulb] ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার সময়, ফিলামেন্টের রোধ বেশী হওয়ায় যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে ফিলামেন্ট ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং আলো প্রদান করে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ জ্যোর্তিবিদ ও রসায়নবিদ **De La Rue** প্রায়

বায়ুশূন্য কাঁচের সেলের মধ্যে প্ল্যাটিনাম কয়েলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠিয়ে আলো উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু প্ল্যাটিনামের বাজার দর, সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে এই বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার অসম্ভব করে তুলবে এই আশঙ্খায় প্ল্যাটিনাম ফিলামেন্ট যুক্ত বৈদ্যুতিক বাতির কোন ব্যবসায়িক উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি।

বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন নিয়ে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা

Thomas Alva Edison সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট রূপে কার্বোনাইজড সূতোকে ব্যবহার করেন। কাঁচের তৈরী প্রায় বায়ুশূন্য সেলের মধ্যে কার্বোনাইজড সূতাকে ফিলামেন্ট রূপে ব্যবহার করে প্রথম যে বৈদ্যুতিক বাতি **Edison** ও তাঁর সহযোগী **Bachelar** উদ্ভাবন করেন তার আয়ুষ্কাল দাঁড়ায় মাত্র ৪৫ ঘন্টা। Edison হতাশ হলেও, হাল না ছেড়ে ফিলামেন্টের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। তিনি উদ্ভিদবিদদের কাছ থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদের ফাইবার জোগাড় করে, তা দিয়ে ফিলামেন্ট তৈরীর চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক গরমের দিনে ক্লান্ত Edison যখন একটি জাপানি oriental পাখায় হাওয়া খাচ্ছিলেন সে সময় বাঁশের তৈরী ঐ পাখার এক সূক্ষ্ম টুকরো তাঁর হাতে খুলে চলে আসে। তাঁর কৌতুহলী মন বাঁশের ঐ সূক্ষ্ম টুকরোটাকে কার্বোনাইজড করে ফিলামেন্ট রূপে ব্যবহার করে। এর পরেই তিনি তার সহযোগীকে জাপানে প্রেরণ করেন ঐ প্রকার বাঁশ সংগ্রহ করে আনতে। এইভাবে Edison ই প্রথম বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবক হয়ে ওঠেন। সে সময় পৃথিবী জুড়ে যে সকল বিজ্ঞানী এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন তারা, নিজ নিজ বৈদ্যুতিক বাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচের দিকে নজর দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু Edison এর ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা তাকে সকলের থেকে এগিয়ে দেয়। তিনি ক্রমাগত ফিলামেন্টের উন্নতি, উন্নত বায়ু নিষ্কাশন পাম্প এবং স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে খবরে প্রকাশ হয় যে Edison এর ২৫ বছর পূর্বে জার্মান বিজ্ঞানী **Henry Goebel** ভাস্বর বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তাঁর আবিষ্কারের জন্য কোনো পেটেন্ট দাবি করেন নি। এরপর Edison Electric Light Co তার প্রাপ্ত পেটেন্ট আইন লজ্ঘন করায় আদালতে অভিযোগ জানায়। আদালত Henry Goebel এর দাবি প্রমাণের অভাবে খারিজ করে দেয়।

১৮৭৪ সালের অগাস্ট মাসে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র **Henry Woodward** এবং **Mathew Evans,** নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনপূর্ণ কাঁচ নলে কার্বন ফিলামেন্ট যুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি তৈরির জন্য কানাডা থেকে পেটেন্ট পান। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট এর আবেদন করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক পণ্য করে তুলতে ব্যর্থ হন। Edison নিজের আবিষ্কারের পেটেন্ট লাভের পূর্বেই ওদের পেটেন্ট কিনে নেয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে **Alexander Lodygin** বৈদ্যুতিক বাতির জন্য রাশিয়া থেকে পেটেন্ট সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্টে চলে আসেন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে বিশ্ব মেলায় মলিবডিনাম ফিলামেন্ট যুক্ত এক বৈদ্যুতিক ভাস্বর বাতি প্রদর্শন করান।

Hiram Maxim, তাঁর United States Electric Lighting Company তে **Ludwing Boehm** কে নিযুক্ত ক'রে, High - resistanee ফিলামেন্ট যুক্ত ভাস্বর বৈদ্যুতিক বাতি উৎপাদন শুরু করে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। এর ফলে Edison এর বৈদ্যুতিক বাতির বাজার হ্রাস পায়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে **George Westinghouse, Maxim** এর কোম্পানি কিনে নেয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে Patent Littigation এর জন্য আদালত Westinghouse এর উৎপাদন বন্ধ করে Edison কে উৎপাদনের জন্য রায় দান করে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে **William Sawyer** এক ভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক আলো উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরী করেন এবং Albon Man এর সঙ্গে এক পেটেন্ট লাভ করে দ্রুত Sawyer & Man Electric Co স্থাপন করেন। Westing House ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিকাগো বিশ্ব মেলায় আলো দান করার জন্য William Sawyer কে চুক্তি বদ্ধ করান। William Sawyer চিকাগো বিশ্ব মেলায় Edison এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেন। এরপর Westing House, Sawyer - Man কোম্পানির পেটেন্ট কিনে নিয়ে পুনঃরায় সাফল্যের সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাতির উৎপাদন শুরু করে দেয়।

অন্যদিকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে, হাইস্কুলের শিক্ষক **Elihu Thomson** এবং Edwin Houston বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে American Electic Company প্রতিষ্ঠা করেন যার পরবর্তী নাম হয় Thomson - Houston Electric Company। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই কোম্পানী Sawyer & Man Electric Company কিনে নেয় এবং Sawyer-Man patent এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ভাস্বর বাতি উৎপাদন করতে শুরু করে।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে, একাধারে পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ **Joseph Wilson Swan** কার্বোনাইজড পেপার ফিলামেন্ট যুক্ত এক বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার এই সাফল্য ১৮৭৮ খ্রীঃ Newcastale এর Tyne Chemical Society-র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। এরপর ১৮৭৯ খ্রীঃ তিনি

সাফল্য অর্জন করেন এবং ১৬ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ১৫০০ ঘন্টা আলো দানে সক্ষম বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেন। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম তার বাড়ীর গেটেই বৈদ্যুতিক বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়। Swan বৃটেন থেকে পেটেন্ট লাভ করে এবং ১৮৮৩ খ্রী কোর্টের মাধ্যমে Edison ও Swan, United Electric Light কোম্পানী তৈরি করেন যা 'Ediswan' নামে বিখ্যাত। এই কোম্পানী যে বাতি তৈরি করত তার ফিলামেন্ট তৈরী হত সেলুলোজ দিয়ে যা Swan ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। Swan তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট Brush Electric Company এর কাছে বিক্রি করে দেয় যা পরবর্তী সময়ে Thomson Houston কোম্পানীর অঙ্গীভূত হয়।

Lewis Howard Latimer দীর্ঘ আয়ু যুক্ত কার্বন ফিলামেন্ট এবং প্যাঁচযুক্ত Socket সম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতি তৈরীর পেটেন্ট অর্জন করেন যা Edison ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কিনে নেয় এবং Latimer কে বেতনের বিনিময়ে কাজে যুক্ত করে।

সে সময়ে বাজারে, ভাস্বর বৈদ্যুতিক বাতির আর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী ছিল Nernst Lamp যা ফিলামেন্ট বাতির সমস্যা অনেকটাই দূর করেছিল। এই বাতি থেকে দিনের আলোর মত আলো বিকিরিত হত। এই বাতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সিরামিক দন্ড ব্যবহার করা হত যা ঘরের তাপ মাত্রায় বিদ্যুতের কুপরিবাহী। এই সিরামিক দন্ডটিকে পৃথক একটি ফিলামেন্ট হিটার দ্বারা উত্তপ্ত করা হতো – যার ফলে সিরামিক দন্ডটি ভাস্বর হয়ে উঠত। একবার সিরামিক দন্ডটি ভাস্বর হয়ে উঠলে হিটারটি তড়িৎ বর্তনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং প্রায় সমস্ত বিদ্যুৎ শক্তিটাই আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সিরামিক দন্ড যেহেতু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হ্রাস পায় না তাই Nernst Lamp শুধু গৃহস্থালীতে নয়, Fax System, চোখ পরীক্ষা, Projection এবং Microscope এ ব্যবহার করা হয়। ১৯২০ খ্রীঃ Walther Nernst রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান। তার নোবেল প্রাপ্ত ছাত্র **Irving Langmuir** তাকে এই বাতি তৈরীতে ব্যাপক সাহায্য করেন। Nernst Lamp এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে অতিরিক্ত সৌন্দর্য সম্পন্ন ও অতিরিক্ত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি তৈরীর চাহিদা বেড়ে গেল। জার্মানিতে **Werner Von Bolton** তৈরী করলেন ট্যাংস্টেন ফিলামেন্ট, যার দক্ষতা ও উজ্জ্বলতা অনেক বেশি। Siemens and Halske কোম্পানি এই বাল্বের বাজার তৈরী করতে সফল হলো। প্রতিযোগিতার ভয়ে General Electric, রিসার্চ ল্যাব তৈরী করল এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী **Willis Whitney, Willian. D. Coolidge** এবং **Irving Langmuir** কে তাদের ল্যাবে নিযুক্ত করল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে Willis Whitney ধাতু আবৃত কার্বন ফিলামেন্ট তৈরি করতে সফল হলেন যার দক্ষতা কার্বন ফিলামেন্ট অপেক্ষা ২৫% বেশি এবং যা বাল্বের ভিতর কালো দাগ তৈরী করে না। এই বাতি বাজারে বিখ্যাত Mazda Lamp রূপে চলতে শুরু করে।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে **Alexander Just** এবং **Franz Hanaman** তৈরী করেন Sintered tungsten যার দক্ষতা দ্বিগুণ, কিন্তু ভঙ্গুর। ১৯০৭ সালে General Electric এই স্বত্ব কিনে নেয় এবং ভঙ্গুর ফিলামেন্টকে William. D. Coolide দৃঢ়তা প্রদান করেন – যা আজও বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট রূপে ব্যবহৃত হয়। Irving Langmuir টাংস্টেনের বাঁকানো Coil ফিলামেন্ট তৈরি করেন যা বৈদ্যুতিক বাতির আয়ুষ্কাল আরও কিছুটা বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা প্রদানকারী হ্যালজেন ল্যাম্প তৈরী করা হয়। সাধারণ ভাবে টাংস্টেন অণু ফিলামেন্ট থেকে বাষ্প হয়ে বাল্বের ভিতরে কাঁচের দেওয়ালে জমা হয়। ফলস্বরূপ ফিলামেন্ট পাতলা হতে হতে এক সময় ছিঁড়ে যায় এবং বাল্বের কাঁচের দেওয়াল কালো হয়ে যায়। General Electric এ কর্মরত অবস্থায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে **Elmer Friedrich** ও **Emmett Wiley** উপলব্ধি করেন যে সামান্য পরিমাণে আয়োডিন, টাংস্টেন ফিলামেন্টের চারিপাশে রেখে ফিলামেন্টেকে উত্তপ্ত করলে, টাংস্টেনের বাষ্পিভূত পরমাণু হ্যালজেন পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয় এবং হ্যালজেন ঠান্ডা হলে পুণরায় টাংস্টেন পরমাণুগুলি টাংস্টেন ফিলামেন্টের উপর জমা হয় – যা হ্যালজেন চক্র নামে পরিচিত। এর ফলে টাংস্টেন ফিলামেন্টকে নিরাপদে দীর্ঘস্থায়ী রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হল এবং হ্যালজেন বাল্বের আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পেল।

পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, নিম্নচাপে গ্যাসপূর্ণ কাঁচ নলে দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে উচ্চ বিভব প্রভেদ (Voltage) প্রযুক্ত করলে গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। আর যখন এই চাপ ০.০১ মিমি পারদ স্তম্ভের চাপের সমান হয় তখন কাঁচ নলের দেওয়ালে প্রতিপ্রভার (Fluoresent) সৃষ্টি হয়। এই প্রতিপ্রভার বর্ণ কাঁচের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

স্থায়ীভাবে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়ার ব্যবস্থা – ব্যাটারি উদ্ভবের পরে, ব্যাটারির মাধ্যমে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত এবং তড়িৎ বর্তনীতে কোন অপরিবাহী বা কুপরিবাহী পদার্থ যুক্ত করা হত না বা বর্তনীর মধ্যে কোন ফাঁক রাখা হত না। কেননা অপরিবাহী/কুপরিবাহী পদার্থ বা ক্ষুদ্র ফাঁক তড়িৎ প্রবাহে বিঘ্ন ঘটিয়ে বর্তনীকে বিচ্ছিন্ন বর্তনীতে পরিণত করে। কিন্তু তড়িৎ বর্তনীতে ধাতব পরিবাহীর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁক (যা বায়ুপূর্ণ) বৈদ্যুতিক স্পার্ক এর সৃষ্টি করে যা বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **Humphry Davy** তার গবেষণা পত্রে একথা উল্লেখ করেন এবং রয়েল সোসাইটি-

র সামনে ব্যাটারি যুক্ত দুটি কার্বন দন্ডকে স্পর্শ করিয়ে সামান্য দূরে তাদের অবস্থান করান। এক অস্পষ্ট ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আর্ক পরিলক্ষিত হয়। রয়েল সোসাইটি ব্যাটারিতে ধাতব পাতের সংখ্যা ১০০০ করার পরামর্শ দেয়। এরপর বিজ্ঞানী ডেভি স্পষ্ট বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। যদিও ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী **Vasily. V. Petrov,** "Special fluid with electric properties" নামে এক পরীক্ষা – প্রদর্শনীতে দীর্ঘ বৈদ্যুতিক আর্ক উৎপন্ন করতে সমর্থন হন। বৈদ্যুতিক স্পার্ক হলো তাৎক্ষণিক, আর বৈদ্যুতিক আর্ক হলো দীর্ঘস্থায়ী। বৈদ্যুতিক আর্ক ব্যাটারিযুক্ত দুটি বিপরীত তড়িৎদ্বারের মধ্যে সাধারণভাবে কুপরিবাহী গ্যাসীয় পদার্থ, প্লাজমায় পরিণত হয়ে তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ অব্যাহত রাখে। তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যে বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করে – চাপ, তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যে দূরত্ব এবং গ্যাস এর প্রকৃতির উপর। স্বাভাবিক বায়ু মন্ডলীয় চাপে কোন গ্যাসীয় মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আর্ক দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। নিম্ন কম্পাঙ্কের পরিবর্তি প্রবাহী তড়িৎ (এ. সি), একমুখী প্রবাহী তড়িতের (ডি. সি) সমতুল্য বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় বৈদ্যুতিক বাতিতে বৈদ্যুতিক আর্ক এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কার্বন আর্ক বৈদ্যুতিক বাতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল Search Light রূপে।

বৈদ্যুতিক বাতির ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Charls F Brush এক নতুন ধরনের Self-regulating arc Lamp তৈরী করেন এবং শক্তির যোগানের জন্য নতুন ধরনের ডায়নামো বানান। একে ভিত্তি করে ১৮৮০-এর দশকে Brush - Electric Company তৈরী হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে **Charles. P. Steinmetz** কার্বন ইলেকট্রডকে ম্যাগনেটাইট দ্বারা প্রতিস্থাপন করায় বাল্বের আয়ুষ্কাল ১২৫ ঘন্টা থেকে বেড়ে ৬০০ ঘন্টা হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে Xenon Short arc বাল্ব তৈরি হওয়ায়, কার্বন আর্ক বাল্ব বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়।

Neon Lamp গুলি প্রকৃত পক্ষে নিম্ন চাপে Gas discharge Lamp, এক ধরনের Cold Cathod Fluorescent Lamp (CCFL)। নিয়ন ও আর্গন গ্যাসের মিশ্রণ পূর্ণ একটি গ্যাস টিউবে দুটি ইলেকট্রোড থাকে। ভোল্টেজ বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আর্গন গ্যাস ইলেকট্রোড দুটির মধ্যে একটি ইলেকট্রিক আর্ক গঠন করে। ফলে নিয়ন গ্যাসের মধ্য দিয়ে বেশি বেশি করে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে এবং বেশির ভাগ অণু আয়নিত হয়। বাজারের বিভিন্ন Show room-এ যে রং বে-রং-এর সাইন বোর্ড দেখা যায় তা জেনন, আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস পূর্ণ; fluorescent-এর প্রলেপ যুক্ত স্বচ্ছ পাত্র। আর্গন বৈদ্যুতিক আর্ক গঠন করলে পাত্রের মধ্যে অবস্থিত পারদ বাষ্পে পরিণত হয় এবং অতি বেগুনী রশ্মি নিঃসরণ করে যা পাত্রের গায়ে প্রলেপ দেওয়া ফসফরাস শোষণ করে এবং বিভিন্ন বর্ণের আলো নিঃসরণ করে।

Mercury vapour Lamp – ভাস্বর বৈদ্যুতিক বাতি ও প্রতিপ্রভা যুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি অপেক্ষা অনেক বেশি দক্ষ, কম তড়িৎশক্তি খরচ করে, এর দীপনমাত্রা ৩৫ থেকে ৬৫ Lumens/Watt। এদের আয়ুষ্কাল ২৪,০০০ ঘন্টা। বিদ্যুত প্রবাহ চালনা শুরুর পর ৪-৭ মিনিট সময় লাগে পূর্ণ উজ্জ্বলতায় পৌঁছাতে। এদের অভ্যন্তরীণ চাপ ২ থেকে ১৮ বার। এই কারণে এদের হাইপ্রেসার মারকারি ল্যাম্প বলা হয়। ১৯০১ সালে প্রথম বাণিজ্যিক মারকারি ভেপার ল্যাম্প তৈরী করেন **Peter Cooper Hewitt**। রাতে রাস্তায় যে সোনালি রং এর আলো জ্বলতে দেখা যায় সেগুলি হল সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প।

Low pressare Sodium (LPS) Lamps এ বোরোসিলিকেট কাঁচ নির্মিত গ্যাস নিঃসরণ টিউবের মধ্যে কঠিন সোডিয়াম এবং সামান্য পরিমাণে নিয়ন ও আর্গন থাকে। তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে প্রাথমিকভাবে ক্ষীণ গোলাপী-লাল আলো বিকিরিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম বাষ্পীভূত হতে শুরু করে এবং বাতিটি উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের আলোয় জ্বলতে থাকে। আমেরিকান পদার্থবিদ **Arthur. H. Compton** ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এল পি এস বাতি উদ্ভাবন করেন এবং এর জন্য তিনি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির Osram কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় **Marcello Pirani,** Sodium resistance glass তৈরী করেন। এরপর জেনারেল ইলেকটিক রিসার্চ ল্যাবে কাজ করার সময় **Robert. L. Coble** লক্ষ্য করেন যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিরামিক (Lucalox), সোডিয়ামের Corrosion effect কে প্রতিরোধ করে। এবিষয়টি জানার পর হাই প্রেসার সোডিয়াম ল্যাম্প তৈরীর পথ প্রসস্ত হয়। HPS Lamp, LPS Lamp অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণের আলো প্রদান করে। সোডিয়াম, পারদ ও জেননের সঙ্গে মিশে অনেক বেশি সাদা বর্ণের আলো প্রদান করে। পারদ সোডিয়ামের হলুদ বর্ণের সঙ্গে সামান্য নীল বর্ণ যোগ করে। Arc tube যেহেতু অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিরামিক দ্বারা নির্মিত হয় তাই সোডিয়ামের ক্ষারীয় ধর্ম এর উপর কোন ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলতে পারে না।

বৈদ্যুতিক আলোর জগতে আশ্চর্য জনক উদ্ভাবন হলো টিউব লাইট। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী **Heinrich Geissler,**

একটি দীর্ঘ কাঁচ নলকে প্রায় বায়ুশূন্য করে, তার মধ্য দিয়ে তড়িৎশক্তি চালনা করে আলো উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই Geissler tube বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে **Alexander Edmond Becquerel** সর্বপ্রথম টিউব লাইটের কাঁচ নলের মধ্যে ফসফরাস ব্যবহার করেন। এরপর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে **Nikola Tesla** এক induction lamp তৈরী করেন যা বর্তমানের fluorescent lamp এর মত ছিল না। কিন্তু তার এই অবদানই বর্তমানের টিউব লাইটের ভিত্তি প্রস্তুত করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে **Thomas Edison** ক্যালসিয়াম টাংস্টেন ফসফরাসের প্রলেপ যুক্ত কাঁচ নল নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। কিন্তু তার সহযোগী **Clarence Dally** – এই পদার্থের বিকিরণের প্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি এই কাজ থেকে সরে যান। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে **Daniel Mc Farlan Moore** দীর্ঘ কাঁচ নলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে যথাক্রমে গোলাপী ও সাদা আলো উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। তার এই টিউব লাইট নিউইয়র্ক শহরে তার কর্মক্ষেত্রকে আলোকিত করেছিল। কিন্তু স্বল্প আয়ু ও বেশি ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় এর বাজারী উৎপাদন সম্ভব হয় নি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে **Edmund Germer** আমাদের বর্তমানের fluorescent lamp তৈরীর দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়। **Albert. W. Hull** এর tube থেকে শক্তিশালী অতি বেগুনী রশ্মি বিকিরণের পরীক্ষা এবং উন্নত ইলেকট্রোড এর ব্যবহারই টিউব লাইটের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে Arthur H. Compton ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে ভ্রমণের সময়, ২ ফুট লম্বা হলুদ-সবুজ রঙের ফসফরাস যুক্ত টিউব লাইট লক্ষ্য করেন এবং General Electric এর William L. Enfield কে তা চিঠি মারফৎ জানান। এই সংবাদ পেয়ে William দ্রুত সাদা রঙের টিউব লাইট (Fluorescent Lamp) তৈরি করতে সচেষ্ট হন। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে **George Inman, Richard Thayer, Eugene Lemmers** এবং **Willard. A. Roberts** ১০ ইঞ্চি লম্ব, ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত কাঁচ নলে Zinc Silicate phosphor ব্যবহার করে সর্ব প্রথম সত্যিকারের ব্যবহার যোগ্য Fluorescent Lamp তৈরি করেন, যা আজও ব্যবহৃত হয়। ঐ একই সময় **Clifton G. Found, Willard Roberts, C.A Mckel** এবং **G. R. Fanda** আরো সাদা আলো এবং দিনের আলোর সমতূল্য আলো উৎপাদনের জন্য Phosphor রূপে ব্যবহার এর জন্য Zinc - beryllium Silicale এবং magnesium tungstate নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯৭৬ সালে **Edward. E. Hammer** CFL Lamp (Compact Fluorescent Lamp) তৈরী করেন। ১৯৮৪ সালে **John. M. Anderson**, Fluorescent Lamp এর প্রভূত উন্নতি ঘটান, যেমন, ছোট **acr** যুক্ত Fluorescent বাতি তৈরি করেন, ballast ব্যতীত Fluorescent বাতি তৈরি করেন, ইলেকট্রোড এরও উন্নতি ঘটান। Anderson এর বৈদ্যুতিক বাতি তৈরির কৌশলের বিষয়ে ২৭টি Patent ছিল। বর্তমানে আমরা ৪০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন যে টিউব লাইট বাড়ীতে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তা নিম্ন চাপ যুক্ত আর্গন ও সামান্য পারদপূর্ণ বদ্ধ কাঁচ নল যার দুই প্রান্তে দুটি টাঙ্গস্টেন তড়িৎদ্বার প্রবেশ করান থাকে। Ballast বা Choke টিউব লাইটের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহকে সীমার মধ্যে রাখে। Choke Coil এর বৈশিষ্ট্য হল এর রোধ কম, বেশি বৈদ্যুতিক আবেশ সৃষ্টি করে যা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রাকে হ্রাস করে, কিন্তু তড়িৎশক্তির কোন অংশকেই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে না। ফলে শক্তির অপচয় হয় না। Starter হল দ্বিধাতব নিয়ন বাল্ব। টিউব লাইট এর বর্তনীতে তড়িৎ যুক্ত করলে তড়িৎদ্বার দুটি উত্তপ্ত হয় যা আর্গন গ্যাসকে আয়নিত করে এবং পারদকে বাষ্পে পরিণত করে। Starter, Choke এর মধ্যে যে তড়িৎ আবেশ সৃষ্টি করে তাই টিউবের মধ্য দিয়ে মেইন লাইন অপেক্ষায় কম বিভব প্রভেদ যুক্ত ও প্রবাহ মাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত করে। Phosohor কাঁচের টিউবের মধ্যে ব্যবহার করা হয় যা অতি বেগুনী রশ্মিকে দৃশ্যমান আলোকরশ্মিতে পরিণত করে।

ইলেক্ট্রনিক্স বিজ্ঞানের আর্বিভাব এবং LED-র উদ্ভব

ইতিপূর্বে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **Julius Robert Mayer** শক্তির সংরক্ষণ সূত্র প্রদান করেন। ফলে রাসায়নিক শক্তি ছাড়াও অন্যান্য শক্তি থেকে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। পাশাপাশি তড়িৎশক্তি সংক্রান্ত গবেষণা তড়িৎশক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত হয়। এরপর তড়িৎ পরিবাহী ও আন্তরক, পদার্থের মাঝামাঝি অর্ধপরিবাহীর (Semi Conductor - সিলিকন, জার্মেনিয়াম) আবিষ্কারও তার প্রযুক্তিগত প্রয়োগ বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা – Electronics এর আবির্ভাব ঘটাল। ইলেকট্রনিক্স হলো তড়িৎশক্তিকে, তড়িৎ প্রবাহের মুখ্য উপাদান ইলেকট্রন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের তত্ত্বগত এই সকল উন্নতির ফলে উদ্ভব হল – জেনারেটার, ট্রান্সফরমার, ডায়োড, ট্রায়োড, ট্র্যাঞ্জিস্টার, রেক্টিফায়ার ইত্যাদি। বিজ্ঞানী **Lee De Forest** যে ট্রায়োড উদ্ভাবন করেন তা-ই প্রথম mechamical device ছাড়াই দুর্বল radio signal ও audio singnal এর বিবর্তন ঘটাতে পারল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আবিষ্কার ছিল বেতার যন্ত্র। বেতার যন্ত্রের বর্তনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল Detector, যা তৈরি করা হতো একটি ক্ষুদ্র ধাতব

তারের সামনে – ক্রিস্টাল রেখে। একে বলা হত "Cat's Whiskers" যা আসলে ছিল Semi Canductar Diod। ১৯০৭ সালে বিজ্ঞানী Henry Joseph Round Marconi পরীক্ষাগারে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, যখন Carborundum (Silicon Carbide) ক্রিস্টালের মধ্যে ১০ ভোল্ট বিভব প্রভেদ প্রযুক্ত করা হয়, তখন হলুদাভ আলো বিকিরিত হয়। এর কারণ তিনি নিজে বুঝে উঠতে না পারলেও বৈদ্যুতিক জগতের কাছে তা প্রকাশ করেন। এরপর একজন রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার **Oleg Vladimirovich Losov** জিঙ্ক অক্সাইড ও সিলিকন কার্বাইড ক্রিস্টাল রেক্টিফায়ার থেকে আলো বিকিরণের ঘটনা লক্ষ্য করেন, যা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম গবেষণা পত্র, "Luminous carborundum detector and detection crystals" শিরোনামে রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি অনাহারে মারা যান এবং তার সমস্ত গবেষণাপত্র নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে **Kurt Lehovec, Carl Accardo** এবং **Edward Jamgochain** সর্বপ্রথম Light emitting diods এর কার্য প্রণালী ব্যাখ্যা করেন।

অর্ধপরিবাহীর মধ্যে দুটি বিপরীত প্রকৃতির impurity মিশিয়ে (dope) বানান হয় P-n Junction, এই P-n Junctim কে ব্যাটারির সঙ্গে revers - biased এ যুক্ত করা হলে তা ডায়োডের ন্যায় কাজ করে [→|←]। এই P-n Junction diode এর কোন ইলেকট্রন কোন hole পূর্ণ করার সময় যে শক্তি ত্যাগ করে তা অনেক সময়ই ফোটন রূপে নির্গত হয়। এই ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৩৮০nm - ৭৮০nm মধ্যে হলে তা আমাদের কাছে দৃশ্যমান আলো রূপে ক্রিয়া করে। এই রূপ P-n Junction diod কেই Light emittong diod তথা LED বলা হয়। এর পর শুরু হয় LED কে বৈদ্যুতিক বাতি রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশনের **Rubin Braunstein**, gallium arsenide (GaAs) থেকে অবলোহিত রশ্মি নিঃসরণ আবিষ্কার করেন – সম্ভবত এই আবিষ্কারই ছিল LED কে দৃশ্যমান আলোক উৎপাদী রূপে গড়ে তোলার সূচনা। ১৯৬২ সালের ৮ই অগাস্ট **Biard** এবং **Pittman**, "Semiconductor Radiant Diode" শিরোনামে এক পেটেন্টের আবেদন করেন, যা ছিল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে LED উৎপাদন ও বাজারজাত করার সূচনা পর্ব। ১৯৬২ সালের ১লা ডিসেম্বর, "Applide Physics Letter" জার্নালে প্রকাশিত হয়, **Nick Holonyak,** General Electric এর সহায়তায় দৃশ্যমান লাল বর্ণের আলো উৎপাদী LED উদ্ভাবনের খবর। এর ১০ বছর পরে ১৯৭২ সালে তারই ছাত্র **M. George Craford** প্রথম দৃশ্যমান হলুদ বর্ণের আলো উৎপাদী LED উদ্ভাবন করেন, এবং লাল ও লাল-কমলা বর্ণের আলো উৎপাদী LED এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। ১৯৭৬ সালে **Thomas P. Pearsall**, Telecommunication এ Fiber optics এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য উচ্চ উজ্জ্বলতা সম্পন্ন আলো উৎপাদী LED সৃষ্টি করেন।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী নীল বর্ণের আলো বিকিরণকারী LED উদ্ভাবন অসম্ভব মনে করলেও Nichia Corporation এর Nakamura এটা সম্ভব বলে বিবেচনা করেন। Nichia-র প্রতিষ্ঠাতা Nobuo Ogawa প্রাথমিকভাবে সমর্থন করলেও, প্রচুর সময় ও খরচ সাপেক্ষ বিবেচনা করে পিছু হটেন। Nakamura, ১৯৯৯ সালে Nichia Corporation ত্যাগ করে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে যুক্ত হন এবং সবুজ LED এর বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তিনিই নীল লেসার ডায়োড এর পথীকৃত যা Blue - ray discs এবং HD DVD তে ব্যবহার করা হয়।

২০১৪ সালে **Shuji Nakamura, Isamu Akasaki** এবং **Hiroshi Amano** পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন উচ্চ উজ্জ্বলতা সম্পন্ন LED উদ্ভাবনের জন্য। Haitz's এর সূত্রানুযায়ী বিংশ শতাব্দীর ছয় এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত LED এর উন্নতি অব্যাহত আছে। এই সূত্রানুযায়ী অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা গেছে প্রতি দশকে LED এর Cost/Lumen একই হারে কমেছে এবং আলোক উৎপাদন ক্ষমতাও ১০০ Lumen/watt ছাড়িয়ে গেছে। আশা করা হচ্ছে ২০২০ সালে এর মান ২০০ Lumen/watt এ পৌঁছাবে। LED তে তড়িৎশক্তি কম খরচ করে বেশি আলো পাওয়া যায়।

১৯৬৩ সালে 'Reader's Digest' এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে **Holonyak** এর অনুমান LED আগামী দিনে Thomas Edison এর incandesceat light blub এর প্রতিস্থাপক হবে। বাস্তবে LED বাতি, পুরানো প্রায় সমস্ত রকমের বৈদ্যুতিক বাতিকে যাদুঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

বৈদ্যুতিক বাতির বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে এটাই দাড়ায় যে আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে এই উদ্ভাবন সরাসরি সম্পর্কিত। প্রাথমিক যুগে সামাজিক চাহিদা মেটাতে এবং শিল্প বিকাশের স্বার্থে এই উদ্ভাবনগুলি ঘটেছিল। সামাজিক চাহিদাই ছিল আবিষ্কারের পেছনে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা। পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে যতই একচেটিয়া রূপ পরিগ্রহ করেছে ততই এর নব নব উদ্ভাবনের চাবিকাঠি একচেটিয়া পুঁজির কোম্পানিগুলির করায়ত্ব হয়েছে। তাদের চাহিদা মেটানোর স্বার্থেই বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন। এক্ষেত্রে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি সামাজিক প্রয়োজন নয়, একচেটিয়া কোম্পানিগুলির মুনাফা। ■

বিশেষ নিবন্ধ

রামসেতু বা আদম ব্রীজ'র রহস্য সন্ধানে

বহু প্রাচীনকাল থেকে এই পৌরানিক কথা বা মিথ প্রচার হয়ে আসছে যে বঙ্গোপসাগরের করমন্ডল উপকূলে তামিলনাডুর রামেশ্বরমের নিকট ধনুস্কটি থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার-এর তালাইমান্নার দ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে একটি সেতু আছে। হিন্দু পৌরানিক মহাকাব্য রামায়ণ অনুসারে তা হল 'রাম সেতু' এবং ইসলাম প্রবর্তিত পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তা হল আদম সেতু বা অ্যাডমস্ ব্রীজ (Adam's Bridge)। বাস্তবে একটি প্রায় ৩০ কি. মি ব্যাপী ১০৩টি ছোট ছোট স্যান্ড বার বা বালির ঢিপি যার কিছু কিছু জলের উপর মাথা উঁচিয়ে আছে, কিছু আংশিক এবং কিছু জলের তলায় ডুবে আছে এবং এই বালির দ্বীপের সারি (স্যান্ড বার) গুলি প্রায় একটি সরলরেখায় অবস্থিত। আকাশ থেকে ছবি তুললে যাকে একটি অর্ধভগ্ন সেতু বলেই মনে হয়। হিন্দু এবং মুসলীম পুরাণে একেই রামসেতু বা আদম সেতু (অ্যাডমস ব্রীজ) বলা হয়েছে।

আজও এটা রহস্য হয়ে আছে কেন ?

প্রাচীনকাল থেকেই পৌরাণিক কাহিনী শুনে যুক্তিবাদী মানুষ প্রশ্ন করে এসেছেন – এটা কি ভগবান রাম এবং তার বানরসেনা (যার প্রধান ছিলেন নল নামে এক বানররূপী দেবতা)-র অলৌকিক কীর্তি নাকি স্বর্গ থেকে মর্তে এসে ঈশ্বরের বা আল্লাহ-র প্রথম মানব সন্তান আদমের কীর্তি? নাকি প্রাচীন যুগের মানুষের সৃষ্টি? নাকি প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট এক বিশেষ ভূপ্রকৃতি?

আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত ভূ-বিজ্ঞানীরা এই তথাকথিত রামসেতু বা অ্যাডম'স ব্রীজের সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা বহুদিন আগেই বিবৃত করলেও এবং এই তথাকথিত 'সেতু'টি যে প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্ট তা প্রমাণ করলেও ধর্মবাদীরা, বিশেষত হিন্দুত্ববাদীরা এই 'সেতু' ভগবান রামের সৃষ্ট বলে প্রচার চালিয়ে আসছে।

এই প্রচার আরও জোরদার হয়েছে যখন গত ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NASA বা নাসা) উপগ্রহ থেকে এই অঞ্চলের অর্থাৎ ভারতের ধনুস্কটি থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার এর তালাইমান্নার দ্বীপের মধ্যে সরলরেখায় অবস্থিত স্যান্ড বার বা শোল (অগভীর সমুদ্রে অবস্থিত নানা বালিয়ারি)-র নানা ছবি তুলে পাঠায় তখন থেকে [চিত্র প্রচ্ছদে]। এই সময় থেকে হিন্দুত্ববাদের পক্ষধর নানা ওয়েবসাইট যেমন কৃষ্ণ ডট অর্গ প্রভৃতি নাসা দ্বারা প্রচারিত ছবিকে পুরাণ কথিত রাম এই সেতু নির্মাণ করেছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করে লিখেছে "NASA Images Discover Aneient Bridge between India & Sri Lanka" বা নাসা-র ছবি ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রাচীন সেতু আবিষ্কার করল। এই ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে "এই তথ্য Archeologist বা প্রত্নতত্ত্ববিদ, যারা মানুষের জন্মবৃত্তান্ত তল্লাস করছেন তাদের কাছে হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এই তথ্য বিশ্বের জনতার কাছে আধ্যাত্মবাদের দরজা খুলে দেবে এবং তারা জানতে পারবেন যে প্রাচীন ইতিহাস কিভাবে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত।" ওয়েব সাইটে দাবি করা হয় যে প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করছে শ্রীলঙ্কায় মানুষের পদার্পণ ১.৭৫ মিলিয়ন বছর আগে হয়েছে, যা আবার রামসেতুর বয়সের সমান। এই সময়কাল রামায়ণে লিখিত সময়কালের সাথে নাকি মিলে যাচ্ছে!

অন্য একটি হিন্দুত্ববাদী ওয়েব সাইট (http/www.patheas.com) থেকে গত ১লা অগাস্ট ২০০৭ সালে লেখা হয় "Adam's Bridge (Ram Setu is a Man-made structure : Top Indian Geologist!" বা "অ্যাডম'স ব্রীজ (রাম সেতু) একটি মনুষ্যসৃষ্ট সৌধ : প্রথম সারির ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ!" এই ওয়েব সাইটে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় এক প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ বদ্রীনারায়ানন, যিনি আবার চেন্নাইস্থিত ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসেন টেকনোলজি-র সার্ভে বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন, সাক্ষাৎকার ছাপান হয়। সেখানে উক্ত ডঃ বদ্রীনারায়ানন বলেছেন – এই অ্যাডামস ব্রীজ প্রকৃতিজাত নয়। এটি মনুষ্যসৃষ্ট এবং আজ থেকে ৫৮০০-৫৪০০ বছর আগেকার সময়কালে কিছু মানুষ বোল্ডার (বড় পাথরের টুকরো) সমুদ্রে ফেলে এই সেতু তৈরি করেছে।

ভারত সরকারের ভূ-বিজ্ঞান দপ্তরের এক প্রাক্তন অধিকর্তাকে দিয়ে এই অপবিজ্ঞানের প্রচার করে হিন্দুত্ববাদীরা আবার জোরে সোরে বলতে শুরু করেছে যে ভগবান রামের জন্মবৃত্তান্তের সাথে এই সময়কাল মিলে যাচ্ছে এবং এই তথ্য প্রমাণ করল যে রামায়ণে লিখিত কাহিনীই সত্য। ভারতীয় হিন্দু পুরাণে যা লেখা আছে তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।

ধর্মবাদীদের এই প্রচার মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস জিইয়ে রাখার সাম্প্রতিক প্রচার শুরু হয় একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে।

১৯৯৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার **সেতু সমুদ্রম শিপ ক্যানেল প্রজেক্ট** (SSCP) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পূর্ব ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত – শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশে জাহাজের মাধ্যমে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে রামেশ্বরম নিকটবর্তী ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী (পক প্রণালী এবং মান্নার উপসাগর) অগভীর সমুদ্র পথ ও অ্যাডমস ব্রীজের উপস্থিতির জন্য প্রায় অতিরিক্ত ৪০০ কি মি যাত্রা করতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্র সরকার দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ১৬৭ কি. মি লম্বা, ৩০০ মিটার চওড়া এবং ১২ মিটার গভীর একটি চ্যানেল আকারের পথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, যা করতে আনুমানিক ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টন পাথর কাটতে হবে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৬০ সাল থেকে পক প্রণালী এবং মান্নার উপসাগরের মধ্য দিয়ে এরকম একটি সমুদ্রপথ তৈরির প্রস্তাব আসে। ধর্মবাদীদের চাপে পাঁচ বার প্রকল্প বাতিল হয়। শেষ মেষ ১৯৯৮ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালীন সময় এই প্রকল্প গৃহীত হয়। এন ডি এ সরকারের বিরুদ্ধে শাসক দলের পক্ষ থেকেই বিরোধিতায় বলা হয় এই প্রকল্প রাম সেতু-কে কাটবে যা কোটি কোটি হিন্দু জনতার ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রবল আঘাত হানবে। ভগবান রামের ঐতিহ্য রক্ষার নামে শুরু হয় আন্দোলন। ২০০৫ সালে ইউ পি এ-১ সরকারের আমলে মনমোহন সিংহ-র প্রধানমন্ত্রীত্বকালে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়া থেকেই ভগবানের ঐতিহ্য রক্ষায় শুরু হয় রামভক্তদের আন্দোলন। হিন্দুত্ববাদী নেতা শ্রী সুব্রমণ্যম স্বামী এবং শ্রী রামগোপালন এস এস সি পি প্রকল্পের উপর স্থগিতাদেশ আনার জন্য দরখাস্তে বলেন – রামায়ণে লিখিত এটি প্রাচীন মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকীর্তি এবং কোটি কোটি মানুষের ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে তা সম্পর্কিত; তাই একে ভাঙা চলবে না, প্রকল্প বাতিল করা হোক। বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন আবার ধর্মবাদীদের দ্বারা পুষ্ট অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলে – এই রাম সেতু / অ্যাডামস ব্রীজ এই অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা করছে, সুনামির মত প্রলয় থেকে রক্ষা করছে, জীব বৈচিত্র রক্ষা করছে এবং এই অঞ্চলে থোরিয়ামের মত প্রাকৃতিক সম্পদ জমা করছে। সুতরাং এই প্রকল্প পরিবেশ এবং মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সুপ্রিম কোর্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে তার বক্তব্য হলফনামার দ্বারা পেশ করতে বলে।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ (এ এস আই)-এর দুই আধিকারিক এর পাল্টা হলফনামায় বলেন – "পৌরাণিক কাহিনী যেমন রামায়ণকে কখনও ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে বিতর্ক অবসানের জন্য যুক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে তা মনুষ্যসৃষ্ট নয়, প্রকৃতিজাত।"

কিন্তু বিজ্ঞানের ধার না ধেরে সরকার ধর্মীয় ভাবাবেগ ও অন্ধবিশ্বাস-কে মদত দিতে প্রকল্প স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এমনকি এ এস আই-এর ওই দুইজন বরিষ্ঠ আধিকারিক, যারা হিন্দুত্ববাদীদের দরখাস্তের জবাব দিয়েছিলেন বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে, আশ্চর্যজনকভাবে সাসপেন্ড করে। এর মধ্য দিয়ে সরকার সরকারি বিজ্ঞান সংস্থার দ্বারা অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে হস্তক্ষেপ করে এবং সরকারি বিজ্ঞান সংস্থার স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করে ধর্মবাদীদের চাপে। শুধু তাই নয়, পুরাতত্ত্ব বিভাগের দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ ঘোষণা করেন "হিমালয় যেমন হিমালয়, গঙ্গা যেমন গঙ্গা, রামও তেমনি রাম। রামের অস্তিত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।"

এদিকে তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, দ্রাবিড় মুন্নেত্রো কাজাঘাম বা ডি এম কে নেতা করুণানিধি তার দলের নীতি অনুসারে সেতু সমুদ্রম প্রকল্প রূপায়ণের দাবি জানায়। কারণ ডি এম কে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির পুনরুত্থান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে এবং ভারতে আর্য জাতির আগ্রাসন নীতির বিরোধিতা করে এবং রাম সেতু-র পৌরাণিক কাহিনীর বিরোধিতা করে। হিন্দুত্ববাদীরা তখন রামের বিরোধিতার জন্য ডি এম কে নেতাদের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে এবং যে বা যারা এই মৃত্যুদন্ড দেবে তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ২০০৭ সালের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে তামিলনাড়ু সহ দেশের নানা প্রান্তে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এখন সেই পরিস্থিতি নাই। তবে শাসকদের প্রয়োজনে আবার তা সৃষ্টি হতে পারে।

রাম সেতু বা আদম সেতু নিয়ে পুরাণের কথা

হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করেন যে রামায়ণের যুদ্ধ কান্ডে যেমন লেখা আছে তেমনই শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা যুগে (তাদের দাবি অনুসারে যার শুরু হয়েছে আজ থেকে ২১,৬৫,০০০ বছর আগে এবং শেষ হয়েছে ৮,৬৯,০০০ বছর আগে), আজ থেকে প্রায় ১৭,৫০,০০০ বছর আগে তাঁর স্ত্রী সীতা-কে লঙ্কারাজা রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে রামেশ্বরমের সমুদ্র পাড়ে উপস্থিত হন। তিনি সমুদ্রকে শান্ত হতে আহ্বাণ করেন যাতে তিনি তা পার হতে পারেন। সমুদ্র কথা না শোনায় তিনি সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবার হুমকী দেওয়ায় সমুদ্রদেবতা বিশ্বকর্মা পুত্র নলকে প্রেরণ করেন সেতু বন্ধনের জন্য। পৌরাণিক স্থাপত্যকার নল বানর সেনাদের নিয়ে মাত্র পাঁচ দিন সময়ে এই সেতু নির্মাণ

করে। যে পাথরগুলি দিয়ে সেতু বানানো হয়েছিল তাতে 'শ্রীরাম' এর নাম লিখে দেওয়ায় সেগুলি জলে ভেসে এসে সেতু তৈরি করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র তার সহোদর লক্ষণকে নিয়ে বানরসেনাসহ ওই সেতু দিয়ে লঙ্কায় হাজির হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাস্ত করে সীতাকে উদ্ধার করে ফিরে আসে। হিন্দুত্ববাদীরা আরও বলে যে রাক্ষস অধ্যুসিত লঙ্কায় ওই সেতুপথ ধরেই প্রথম মানুষের পদার্পণ।

মুসলমান ধর্মগুরুদের দাবি ওই তথাকথিত সেতুটি ঈশ্বর বা আল্লাহ-র প্রথম মানব সন্তান আদম সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার আদম পর্বতে পাওয়ার পথে আল্লাহ-র নির্দেশ অমান্য করায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে আদম হাজার বছর ধরে বর্তমান পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগরের অঞ্চলে দাঁড়িয়েছিলেন। আদমের পায়ের চাপে পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর গঠিত হয় এবং দুই পায়ের মাঝে মাটি উঁচু হয়ে আদম সেতু-র জন্ম দেয়। ফলে পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর আসলে আদমের দুই পায়ের ছাপ এবং ওই সেতুটি আদমের পায়ের চাপে সৃষ্ট।

রাম সেতু বা আদম সেতু'র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

রামসেতু বা আদম ব্রীজ (সেতু) হল শ্রীলঙ্কার উত্তর পশ্চিমে মান্নার ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের রামেশ্বরম নিকটবর্তী ধনুষ্কোটির মধ্যবর্তী একটি ১০৩টি বেলেপাথরের সারি বা স্যান্ড বার বা লম্বা বালির বাঁধ (স্যান্ড ব্যাঙ্ক)। এই তথাকথিত সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ কি. মি, যা উত্তরের পক প্রণালী এবং দক্ষিণের মান্নার উপসাগরকে বিভক্ত করেছে। এই অঞ্চলের সমুদ্র একেবারে অগভীর এবং কোন কোন স্যান্ড বার বা বেলে পাথরের দ্বীপগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে থাকায় শুকনো আবার কোন কোন অঞ্চলে স্যান্ড বারগুলি সমুদ্রতল থেকে মাত্র ৩ ফুট থেকে ৩০ ফুট গভীরে আছে। এই কারণে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে জাহাজ চলাচল একেবারেই অসম্ভব। ব্রিটিশ শাসনকালে ইন্দো-সিলোন রেলওয়ে সার্ভিস চালু ছিল। কেউ চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) স্টেশন থেকে পামবাম দ্বীপ অবধি রেলে চড়ে সেখান থেকে ওই তথাকথিত রামসেতুর উপর দিয়ে ফেরীতে শ্রীলঙ্কার তালাইমান্নার অবধি গিয়ে সেখান থেকে আবার রেলগাড়িতে চড়ে কলম্বো যেতে পারত। ১৯৬৪'র সাইক্লোন ধনুষ্কোটি দ্বীপ ধ্বংস করে। ১৯৮২ সাল থেকে রাজনৈতিক কারণে এই ফেরী চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এই তথাকথিত সেতুটির উত্তরে পক প্রণালীতে সমুদ্রে ঢেউ আছে, সমুদ্র অশান্ত এবং জলের তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৬০°-৭০° সেলসিয়াস। এর কারণ নীচে ম্যান্টেল পিউমের উপস্থিতি। এখানকার স্যান্ড বারগুলিতে তেমন কোন প্রবাল প্রাচীর (Coral reef) দেখা যায় না।

অন্যদিকে এই তথাকথিত সেতুর দক্ষিণে মান্নার উপসাগর শান্ত, জলের উষ্ণতা কম এবং স্যান্ড বারগুলির উপর প্রবাল প্রাচীর দেখা যায়। এই প্রবাল প্রাচীরের মাথা চ্যাপ্টা বা কখনও তা দ্বীপের গায়ে বিনুনি আকারে থাকায় এগুলিকে রিবন এবং অ্যাটল রিফ (ribbon & attol reef) বলে।

ভূ-তাত্ত্বিকভাবে রামসেতু বা আদম সেতু'কে বলা হয় **শোল** (Shoal), যা অগভীর সমুদ্রপৃষ্ঠে ছোট, বড়, লম্বা বালির দ্বীপের সারি। এই দ্বীপগুলির কোনটা সমুদ্রের জলের উপর মাথা উঁচিয়ে আছে, আবার কোনটা জলে আধডোবা বা পুরোটাই ডুবে আছে। এই দ্বীপগুলি নুড়ি, বালি, পলি (Conglomerate, Sandstone, Calcarerous Sandstone & Siltstone) দিয়ে তৈরী হয়। এই বালির পাহাড় বা স্যান্ড বার (বালির বাঁধ) গুলি লম্বা ও সরু আকারের হয় এবং গড়ে ওঠে সমুদ্র উপকূলে নদী বা সমুদ্র স্রোতের দ্বারা নিয়ে আসা পলির সঞ্চয়ের দ্বারা। আলোচ্য পক প্রণালী ও মান্নার উপকূলের সমুদ্রত্বক মায়োসিন-প্লাইস্টোসিন যুগের চুনাপাথর দিয়ে প্রধানত গঠিত। এই ত্বকের নীচে আছে দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরের প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের রূপান্তরিত শিলা (Continental crust)। এই বালির বাঁধ বা পাহাড়গুলির পলিসঞ্চয় উৎপত্তিস্থলের চরিত্র, বেসিনের (যেখানে পলিসঞ্চয় হয়) ভূআলোড়ণের (টেকটনিক) চরিত্র, সমুদ্রস্রোত, ঢেউ এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঢেউ এর ক্রিয়ার সমুদ্রতলের ক্ষয় ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই প্রকার বালির বাঁধ বা পাহাড়গুলি দৈর্ঘ্যে কয়েক মিটার থেকে কয়েক কি. মি অবধি হতে পারে। লম্বায় বিশাল আকৃতির হলে এবং সাধারণত সমুদ্রের পাড়ের সমান্তরালে গড়ে উঠে পাড় অবধি ঢেউকে পৌঁছাতে বাধা দেয় বলে তাকে ব্যারিয়ার দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। উত্তর আমেরিকার সমুদ্র পাড়ে এমন জিনিস দেখা যায়। এই দ্বীপ বা বাঁধগুলির উপর প্রবাল প্রাচীর (Coral reef)-এর জন্ম হয়। তথাকথিত রামসেতু-র দক্ষিণে মান্নার উপসাগরে এমনটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু নীচে ম্যান্টল প্লিউমের উপস্থিতিতে জলের উষ্ণতা অতিরিক্ত হওয়ায় (৬০-৭০° সেলসিয়াস) এবং প্রবল ঢেউ-এর উপস্থিতির জন্য পক প্রণালীতে তেমনভাবে প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। এই বালির বাঁধ গড়ে উঠলে পিছনের মূল সমুদ্র স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগভীর উপহ্রদ (লেগুন)-এর জন্ম দেয়। এই কারণে রামেশ্বরম বা মান্নার উপকূলে সমুদ্রের ঢেউ নেই, সমুদ্র শান্ত বঙ্গোপসাগরের অন্য অঞ্চলের তুলনায়। যদিও রামায়ণে বলা আছে রামের কথায় এই অঞ্চলে সমুদ্র

শান্ত হয়েছিল। এই ভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় এই ধরণের অঞ্চলে বিশেষ প্রকার বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) গড়ে ওঠে।

সঞ্চয়জাত অন্যান্য বালির বাঁধগুলি নিম্নরূপ ঃ

টম্বোলো (Tombolo) – একপ্রকার লম্বা পলিসঞ্চয়জাত ভূপ্রকৃতি, যা কোন দ্বীপ থেকে সমুদ্রের দিকে অথবা দুটি দ্বীপকে সংযোগসাধান করে গড়ে ওঠা বাঁধ।

ইস্‌থমাস (Isthmus) – একপ্রকার বালির পাহাড় যা মহাদেশীয় ভূখন্ডকে জুড়ে দেয় এবং দুপাশের সমুদ্র এতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এক পক প্রণালী গড়ে ওঠে।

স্পিট (Spit) – একপ্রকার সঞ্চয়জাত ভূ-প্রকৃতি যা সমুদ্রতট থেকে দূরে গড়ে ওঠে এবং সমুদ্রতটের সমান্তরাল স্রোতের প্রভাবে পূর্বে সঞ্চিত পলিগুলি পুণরায় স্থান পরিবর্তন করে সরে সরে যায়। যেখানে সমুদ্রস্রোত গতিপথ পরিবর্তন করে সেখানে বালির বাঁধটি বাঁক নিয়ে লম্বা দ্বীপের আকার নেয়, আর যেখানে স্রোত মিলিয়ে যায় সেখানে স্পিট থেমে যায়।

এই হ'ল **শোল, টম্বোলো, ইসথমাস** বা **স্পিট**-এর ন্যায় পলিসঞ্চয়জাত বাঁধ বা দ্বীপের রকমফের। এগুলি পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রতটে নানা আকারে ও নানা মাপে গড়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে সমুদ্র স্রোত, ঢেউ-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঢেউ-এর ক্রিয়ায় সমুদ্রতটের ক্ষয়, সমুদ্র তলদেশে পলিসঞ্চয়ের ক্ষমতা, সমুদ্রতল বা বেসিনটি কতটা বসে যাচ্ছে – সমুদ্রতলে চ্যুতিতলের উপস্থিতি ইত্যাদি (টেকটনিক বা ভূ-আলোড়ণ জনিত বিষয়)-র উপর নির্ভর করে পলির সঞ্চয়জাত ও ক্ষয়জাত ভূপ্রকৃতি গড়ে ওঠে।

পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া, হংকং, বাল্টিক সাগর, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, জামাইকা, জার্মানি, ঘানা, নিউজিল্যান্ড, ইউক্রেন, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রায় ৫০টি 'রামসেতু'-র ন্যায় শোল আছে। এদের চেহারা, ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, জন্ম ইতিহাস প্রায় 'রামসেতু'-র ন্যায়। গ্রীস, মেক্সিকো, চিলি, গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগকারী পানামা দেশটি ইসথমাসের উদাহরণ। আসলে গোটা পানামা দেশটাই একটা ইসথমাস। অস্ট্রেলিয়া, ইয়মেন, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, হংকং, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বা ভূখন্ডে টম্বোলো দেখা যায়।

ভূ-বৈজ্ঞানিকদের মতে ওই তথাকথিত রাম সেতু বা আদম সেতু হল চুনামিশ্রিত বেলে পাথর (Calcareous Sandstone) এবং নুড়িপাথর (Conglomerate) দ্বারা সৃষ্ট বালির বাঁধ বা **শোল**। এই বাঁধগুলির উপর নানা জায়গায় (বিশেষতঃ মান্নার উপসাগরে) প্রবাল জন্মে একে আরও শক্ত করেছে। প্রফেসর জয়ন্ত নারলিকর সহ মাদুরাই কামরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভূ-তাত্ত্বিক জানিয়েছেন যে এই রামসেতু বা আদম ব্রীজ-এর বয়স প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার বছর। এই অঞ্চল প্লাইসটোসিন যুগের পর থেকে অগভীর হয়ে পড়েছে এবং গত ১ লক্ষ বছর ধরে এই তথাকথিত সেতু (তার অধিকাংশ সময়) সমুদ্রে মাথা উঁচিয়ে আছে।

বর্তমানে বিভিন্ন সমুদ্রে সমুদ্র স্রোত উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত (মেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা জল নিরক্ষরেখা বরাবর বয়ে আসার মধ্য দিয়ে এই স্রোত সৃষ্টি হয়) হয়। এই স্রোত ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের ও শ্রীলঙ্কার পশ্চিম উপকূলের ক্ষয়কার্য করে পলির সৃষ্টি করেছে। নদী বাহিত ও সমুদ্র স্রোত দ্বারা ক্ষয়জাত পলি সমুদ্র স্রোত ও ঢেউ-এর দ্বারা ভারতের পূর্ব উপকূল ও শ্রীলঙ্কার পশ্চিম উপকূলে তির্যকভাবে আছড়ে পড়ে সেই বিন্দু থেকে (ক্যারামের ঘুঁটির মত) লম্বভাবে ফিরে এসে পাড় থেকে একটু দূরে সঞ্চিত হয়। এইভাবে সঞ্চিত পলিগুলি আবার সমুদ্রের পাড়ের সমান্তরাল স্রোতের প্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে পলি সঞ্চয় হওয়ার পর সমুদ্র অগভীর হওয়া শুরু হয় (বেসিনের নীচে নামার হার কমতে থাকে)। তখন এই পলিগুলি স্যান্ড বার বা স্যান্ড ব্যাঙ্ক আকারে উঠে এসে সমুদ্রকে আরও অগভীর করে ফেলে। এই কারণে রাম সেতু বা আদম ব্রীজ-এর মত বাঁলির বাঁধকে **শোল** বলে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই তথাকথিত সেতু-র উপর গবেষণা চালায় ডিসেম্বর ২০০২ থেকে মার্চ ২০০৩ সময়কালে। এই গবেষণা প্রকল্পের নাম 'রামেশ্বরম প্রকল্প'। এই তথাকথিত সেতু বরাবর প্রায় ৪ কি. মি অন্তর ৪টি কূপ খনন করা হয়। সমস্ত চর্চার পর জি এস আই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এটি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট স্থাপত্য এমন কোন প্রমাণ নেই। রেডিওমেট্রিক ডেটিং পদ্ধতিতে জানা যায় যে রামেশ্বরম দ্বীপটি উঠে এসেছে আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বছর আগে।

সমুদ্রতলের প্রাচীন ভূ-প্রকৃতি বা প্যালিও জিওগ্রাফি চর্চা থেকে জানা গেছে যে এই অঞ্চলের সমুদ্রতল নিয়মিত ওঠা নামা করেছে (marine transgression & regression)। আজ থেকে ৬০০০-৭০০০ বছর আগে সমুদ্রতল ছিল বর্তমান সমুদ্রতল (উপরের জলতল) থেকে ১৭ মিটার নীচে। প্রায় ১০,০০০ বছর আগে সমুদ্রতল ছিল বর্তমানের চেয়ে ৬০ মিটার নীচে। রেডিওমেট্রিক ডেটিং (তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে বয়স নির্ধারণ) থেকে জানা যায় যে শেষ বরফ যুগ (Ice age)-এর সময় (আজ থেকে প্রায় ২০,২৬০ বছর আগে) সমুদ্রতলের উচ্চতা

ছিল আজকের তুলনায় ১১৮ মিটার নীচে। এরপর থেকে সমুদ্রতল ধীরে ধীরে উঠেছে (কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক উঠা-নামা সহ)। রামেশ্বরম ও তালিমান্নার-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল আজ থেকে ৭০০০-১৮০০০ বছর আগে জলতলের উপরে ছিল।

কূপের (bore hole) পাথর পরীক্ষা করে জানা গেছে যে এখানে মানুষের তৈরি কোন স্থাপত্য বা স্ট্রাকচারের হদিশ নেই বরং ৩টি পর্যায়ে কাদাপাথর (Siltstone), চুনাপাথর (Limestone/Calcarers Sandstone), বেলেপাথর (Sandstone) এবং নুড়িপাথর (Conglomerate) পাওয়া গেছে।

২০০৩ সালে মেরিন এন্ড ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ (SAC/ISRO) মহাকাশের উপগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা চালায় ওই তথাকথিত সেতুটি মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কি না জানার জন্য। ভারতীয় রিমোট সেনসিং ডাটার সাহায্যে ২০০০ সালের গবেষণায় জানা যায় যে এটি প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট স্থাপত্যের কোন উদাহরণ বা প্রমাণ এখানে নেই। এই গবেষণাপত্রে বলা হয় যে আদম ব্রীজ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট নয় এবং তা ১০৩টি ছোট সরলরেখায় অবস্থিত বালিয়াড়ি দ্বারা গঠিত, যার মাথাগুলিতে অনেক জায়গায় প্রবাল প্রাচীর আছে। উঁচু দ্বীপগুলির মাঝে মাঝে গভীর খাদ আছে। এছাড়া আরও বলা হয় যে দ্বীপগুলি সরলরৈখিক চেহারা প্রমাণ করে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত ও শ্রীলঙ্কা অতীতে একসাথে যুক্ত ছিল এবং তৎকালীন সমুদ্রতটের সমান্তরালে এই লম্বা বালির বাঁধ গড়ে উঠেছিল।

ভি. ও. চিদাম্বরম কলেজ, টুটিকোরিন এর ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান এন. রামানুজম এই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস বিস্তারিতভাবে চর্চা করেছেন। তাঁর মতে ব্লক ফল্টিং, ভূমিতলের বসে যাওয়া এবং লম্বালম্বি খাদের সৃষ্টি এই অঞ্চলের ভূআলোড়ণজনিত (টেকটনিক) কারণে হয়েছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে ইন্ডিয়ান প্লেটের প্রি-ক্যামব্রিয়ান বেসমেন্ট পূর্ব এবং পশ্চিম গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে ১৫-৭ কোটি বছর আগে পৃথক হয়েছে। ইন্ডিয়ান প্লেটের উত্তরমুখী যাত্রা এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সাথে সংঘর্ষের ফলে ইন্ডিয়ান প্লেটের সঙ্গে ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘাতস্থল থেকে স্ট্রেসের অভিমুখ পরিবর্তন হয়ে ত্রিকোণাকৃতি ভারতীয় পেনিনসুলারের দিকে আঘাত করে এবং সমুদ্র উপকূলের উপর এসে পড়ে। ফলে সমুদ্রত্বকের নীচের ম্যাগমা ঠেলে উপরে উঠে আসে (প্লিউম অ্যাক্টিভিটি) দক্ষিণ পেনিনসুলার দিকে। এর ফলে দক্ষিণ ভারতের উপকূল বসে গিয়ে কাবেরী বেসিনের জন্ম হয় এবং ভূত্বকের নীচে ফাটল (ব্লক ফল্টিং) সৃষ্টি হয়। এই কারণে এই সময় দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে অনেকগুলি লম্বা খাদের সৃষ্টি হয় মধ্যবর্তী উচ্চ জায়গার (রীজ) মাঝে।

এই উচ্চ জায়গাগুলিতে প্রবাল গড়ে ওঠে এবং যার মধ্যবর্তী খাদগুলিতে পলি জমার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। মান্ডাপাম ও রামেশ্বরমের মধ্যে যা ছিল প্রাচীন ভূত্বক তাই পরবর্তীতে ৩০ কি. মি লম্বা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বালির বাঁধ সৃষ্টি করেছে। এই বালির বাঁধ রামেশ্বরম – মান্ডাপাম সমুদ্র উপকূলকে বদলে দিয়েছে এবং সমুদ্র স্রোতের বিরুদ্ধে দেওয়াল হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রাচীন সমুদ্রের গতিকে উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বদলে পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী করে তুলেছে। সমুদ্র স্রোতের এই পরিবর্তনের ফলে ধনুষ্কোটি এবং তালাইমান্নার স্পিটের জন্ম হয়েছে এবং এই স্পিটগুলির পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এগিয়ে যাওয়ার ফলে বালির ব্যারিয়ার দ্বীপপুঞ্জের জন্ম হয়েছে। যারই পৌরাণিক নাম আদম ব্রীজ বা রাম সেতু।

নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে বলা যায় যে বরফ যুগের সময় এই বালির বাঁধ এর উপর বরফ জমে তা প্রকৃতপক্ষে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি সেতু সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়কালে প্রবল শীতের হাত থেকে রক্ষার অভিপ্রায়ে আজ থেকে ১ লক্ষ – ৭০ হাজার বছর সময়কালে ভারতের আদিম মানুষদের একদল (হোমো সেপিয়ানস সেপিয়ানস নয়) অন্যান্য পশু সহ শ্রীলঙ্কায় পৌঁছায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আফ্রিকা মহাদেশেরও এমন একটি বরফের তৈরি সেতুর সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রের উপর। এই সেতু দিয়ে জিরাফ, রাইনো প্রভৃতি নানা মেরুদন্ডী স্থলচর প্রাণী হিমালয় থেকে আফ্রিকায় চলে গেছিল ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বরফযুগ শেষ হওয়ার পর সেতু গলে যায়, ওই প্রাণীরা আর ফিরে আসে নি।

আগেই বলা হয়েছে যে এই আলোচ্য তথাকথিত সেতুটি দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মানুষ যাতায়াতের পথ হিসাবে ঐতিহাসিক ভাবেই ব্যবহার হয়ে এসেছে। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ধনুষ্কোটি থেকে তালাইমান্নার অবধি ফেরী সার্ভিস চালু ছিল। তামিল জাতীয়তাবাদীদের (এল টি টি ই) যাতায়াতের পথ বন্ধ করতে এই সময় থেকে ফেরী বন্ধ আছে। শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যেহেতু রামভক্ত নয় তাই তারা একে পবিত্র রামসেতু হিসাবে বিচার করে না।

'রাম সেতু' নিয়ে ধর্মবাদীদের অপবিজ্ঞান প্রচারের জবাব

প্রাচীনকাল থেকে ধর্মবাদীরা কল্পিত কাহিনী প্রচার করে মানুষকে অন্ধকারাগারে বদ্ধ রাখার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। কিন্তু যুক্তিবাদের প্রচার-প্রসার এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এইসব

কল্পিত কাহিনীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভাঙতে থাকে। এই কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এসে ধর্মবাদীরা অন্ধত্বের প্রতি বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে অবিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মিশেল ঘটিয়ে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের তাই বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে অপবিজ্ঞানের মুখোস খুলে দিতে হবে।

এইবার আসা যাক তথাকথিত 'রাম সেতু' নিয়ে অপবিজ্ঞানের প্রচার ও তার জবাব সম্পর্কে –

১) ধর্মবাদীরা প্রচার করে প্রস্তরখণ্ডে **'শ্রীরাম'** লিখিত জলে ভাসমান শিলা দ্বারা রামসেতু-র নির্মাণ হয়েছিল। বিজ্ঞান বলে জলে ভাসমান শিলা সাধারণভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে একমাত্র পিউমিস (pumice) নামক একপ্রকার লাভাজাত শিলায় প্রচুর পরিমাণে ছিদ্র (Vesicle) থাকায় তার ঘনত্ব কম হওয়ায় সাময়িক সময়ের জন্য তা জলে ভেসে থাকতে পারে। ছিদ্রগুলি জলে পূর্ণ হয়ে গেলে ওই শিলা তার দ্বারা অপসারিত জলের তুলনায় ভারি হয়ে যায়, ফলে আর জলে ভেসে থাকতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল 'রামসেতু' কি পিউমিস দ্বারা গঠিত? না চুনামিশ্রিত বেলেপাথর ও নুড়ি পাথরে গঠিত। রামেশ্বরম উপকূলে কোন আগ্নেয়গিরি নেই, বহু লক্ষ বছর আগেও ছিল না, আর পিউমিস এই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসে কখনও মেলে নি।

২) 'রামসেতু' গাছের গুঁড়ি, প্রস্তরখন্ড দিয়ে 'ক্রেতা' যুগে অর্থাৎ আজ থেকে ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার বছর থেকে ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার বছর সময়কালের মধ্যে বানানো হয়েছিল বলে হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করে। কিন্তু ভূবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দ্বারা বয়স নির্ধারণ প্রণালীতে দেখা গেছে যে ওই তথাকথিত সেতু-র জন্মকাল আজ থেকে মাত্র ১ লক্ষ ৭০ হাজার বছর আগে হয়েছে এবং এই পর্যায়কালে সমুদ্র জল তলের বার বার ওঠা নামার ফলে কখনও তা জলে ডুবে থেকেছে আবার কখনও জলের উপর থেকেছে। এছাড়া এই তথাকথিত রামসেতু-তে কোন গাছের গুঁড়ি বা কান্ডের জীবাশ্মের হদিশ মেলে নি।

৩) হিন্দুত্ববাদী ওয়েব সাইট কৃষ্ণ ওট অর্গ প্রচার করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নাসা-র তোলা চিত্র রামসেতু-র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। কিন্তু তাদের দ্বারা প্রচারিত উপগ্রহ চিত্র নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মিথ্যা প্রচার প্রসঙ্গে নাসা-র বিজ্ঞানীরা বলেছেন "আমাদের ওয়েব সাইটে প্রচারিত উপগ্রহ চিত্রটি আমাদের হলেও এর যে ব্যাখ্যা প্রচার হচ্ছে তা আমাদের নয়। ... মহাকাশের কক্ষপথ থেকে রিমোর্ট সেন্সিং পদ্ধতিতে তোলা ছবি থেকে কখনও সরাসরি লম্বা দ্বীপের সারির বয়স বা জন্ম বৃত্তান্ত জানা সম্ভব নয় এবং তা অবশ্যই নির্ধারণ করতে পারে না এই ধরণের ভূ-প্রকৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের কোন ভূমিকা আছে, কি না।"

৪) অপবিজ্ঞান প্রচারের স্বার্থে হিন্দুত্ববাদীরা যে 'ভাড়াটে বিজ্ঞানী'কে জোগার করে করেছে সেই ডঃ বদ্রীনারায়ানন বলেছেন এটি নাকি মনুষ্য সৃষ্ট এবং আজ থেকে ৫৮০০-৫৪০০ বছর আগে কিছু মানুষ বোল্ডার ফেলে তা তৈরি করেছে। প্রথমতঃ জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার bore hole data-তে কোন boulder মিলল না অথচ বদ্রীনারায়ানন সাহেব তা পেলেন কোথায়? তার দ্বারা সংগৃহীত স্যাম্পেল বা গবেষণার বিষয়গুলি কোথায়? তিনি এই নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আজগুবি কথা বলার সময় বদ্রীনারায়ানন সাহেব হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার অনুসারে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বছর (ক্রেতা যুগ) পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করে সভ্য মানুষের সময়কাল অর্থাৎ ৫৮০০-৫৪০০ বছর সময়কালের কথা বলেছেন। যে হিন্দুত্ববাদীরা ওই তথাকথিত 'প্রথমসারির ভূ-তত্ত্ববিদের' সাক্ষাৎকার প্রচার করেছেন তারা কি ক্রেতাযুগ বা রামের জন্মলগ্ন নিয়ে পৌরানিক মত থেকে সরে এসেছেন? তবে কি রাম তথাকথিত ক্রেতা যুগের দেবতা নন? পৌরানিক কাহিনীকে বৈজ্ঞানিক মোড়কে ঢাকতে হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা প্রচারিত রচনা "Historicity of the Eras of Lord Rama and Slri krishna" গ্রন্থে 'Plane tarium Gold' software এর সাহায্যে অযোধ্যা রাজ্যের অবস্থানকে বিচার করে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে শ্রীরামের জন্মকাল তারা ৫১১৪ বি সি বা আজ থেকে ৭১৩১ বছর আগে ১০ই জানুয়ারি নির্ধারণ করেছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করেছেন আজ থেকে ৭০৯৩ বছর আগে। অর্থাৎ এই অপবিজ্ঞানকে মেনে নিলে রামসেতু-র জন্ম হয়েছে আজ থেকে ৭০৯৩ বছর আগে। আজগুবি গল্পকে অপবিজ্ঞানের মোড়কে সাজাতে গেলে এমনই হয়!

৫) হিন্দুত্ববাদীরা এবং তাদের সংঘ পরিবার প্রচার করে যে আজ থেকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে এই 'রামসেতু' দিয়েই নাকি শ্রীলঙ্কায় প্রথম মানুষ পা রেখেছে রামের লঙ্কা অভিযানের সময়। এই প্রচার সম্পূর্ণ আজগুবি এবং অবৈজ্ঞানিক। মানুষের বিবর্তন প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীমহল এই অভিমতে পৌঁছেছে যে আধুনিক মানুষ (Homo sapiens sapiens) এর অস্তিত্ব আজ থেকে ৩ লক্ষ বছর আগে ছিল না। বিজ্ঞান এটাও প্রমাণ করেছে যে শ্রীলঙ্কা সহ ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক মানুষের আর্বিভাব ১ লক্ষ বছরের আগে হয়নি। সুতরাং তথাকথিত ক্রেতা যুগে রাম ও তার তৈরি সেতু-র গল্প কাল্পনিক, বাস্তব নয়।■

প্রবন্ধ ঃ

চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল-হকিকত এবং সমাধানের উপায়

আদিমযুগে মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বের করেছে ঔষুধিগুণ সম্পন্ন বহু ভেষজ। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছে। অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, সাফল্য-ব্যর্থতা, নতুন অভিজ্ঞতা, তার প্রয়োগ ছিল চিকিৎসাবিদ্যার ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্র। অভিজ্ঞতা লব্ধ ভেষজের প্রয়োগ ও শুশ্রূষাই ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি। সমস্যার কারণ জানা না থাকায় সমস্যা নির্মূলের চেয়ে উপসম ছিল প্রধান। এই চিকিৎসা ছিল মানব জাতির প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমাজ বিবর্তনের পথেই অভিজ্ঞতা লব্ধ চিকিৎসা ক্রমশ বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে বদলাতে শুরু করে – উপস্থিত হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান।

ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পর্যায়

(১) ভেসালিয়াস কর্তৃক শবদেহ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে মানব দেহের অ্যানাটমি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, (২) লুই পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, (৩) উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার, (৪) জেনার কর্তৃক স্মল পক্সের টিকা আবিষ্কার, (৫) কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার কর্তৃক রক্তের শ্রেণীবিভাগকরণ, (৬) আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক পেনিসিলিনের আবিষ্কার – প্রভৃতি যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি চিকিৎসাকে বিজ্ঞান নির্ভর করে তোলে। শুরু হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ। এক সময় যে "চিকিৎসা" ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতা নির্ভর সংগ্রাম, তা **চিকিৎসা বিজ্ঞানে** পরিণত হয়ে প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয় –

(১) চিকিৎসা কেন্দ্র; (২) বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ; (৩) প্রশিক্ষিত নার্স; (৪) চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্যাথলজি, রেডিওলজি ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা; (৫) রক্ত ও রক্তের উপাদান নির্ণয়; (৬) প্রয়োজনীয় ঔষুধ, ইঞ্জেকশন, স্যালাইন ইত্যাদি, (৭) অক্সিজেন, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা, পেশমেকার ইত্যাদি, (৮) ফিজিও থেরাপী এবং অন্যান্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদনকারী কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও মানব জীবনে তা প্রয়োগের ফলে চিকিৎসা পরিষেবা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নির্ভর না থেকে ব্যাপক সামাজিক রূপ ধারণ করে। সৃষ্টি হয় চিকিৎসার বাজার, চিকিৎসা পরিণত হয় পণ্যে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠে চিকিৎসা ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই পরিচালিত হতে থাকে চিকিৎসা ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো মুষ্টিমেয়র প্রাচুর্য এবং ব্যাপক সাধারণের নিঃস্বতা। এই নিয়মেই আজও ব্যাপক সাধারণ মানুষ আধুনিক চিকিৎসা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

১৯১৭ সালে রুশ অক্টোবর বিপ্লবের পরে, সেদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সে দেশে চালু হয় Universal Health Care। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে কোন বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ছিল না। সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীন। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সরা ছিল চিকিৎসা প্রদানের কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। **বৃটিশ সাংবাদিক ডাইসন কাটারের** বর্ণনায় সোভিয়েতের চিকিৎসা পরিচালনার তৎপরতা, চিকিৎসক ও রোগীর অনুপাত, আধুনিক চিকিৎসার গবেষণা ও প্রয়োগের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে [এই সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে পৃথক রচনা প্রকাশিত হল]। সোভিয়েতের জনসাধারণ চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা, পরামর্শ ও ঔষুধ পেত। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সেসময় সেদেশের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তাদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী পালিত হওয়ায় সকলেই বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। একই ধরণের ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গড়ে ওঠে বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক চীন এবং অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। রুশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের প্রতিটি দেশে শ্রমজীবীদের অধিকার বোধ ও অধিকার অর্জনের চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় থেকে বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণবন্টন ব্যবস্থা সহ সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

১৯৪২ সালে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম হেনরি বেভরিজ এক প্রতিবেদনে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা এই ভাবে দিয়েছিলেন যে, "অভাব থেকে মুক্তি", বেভরিজ পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বৃটেনে, "জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা"র উদ্যোগ

নেওয়া হয়। রাষ্ট্র সংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের বিবৃতিতে নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা পরিচর্যার দরকার এমন সব মানুষের জন্য মোটামুটি আয়ের বন্দোবস্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসারে রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করার বিষয়টি উল্লিখিত হয়। ১৯৮৯ সালে ট্রেজ এবং সেন-এর আলোচনা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ধারণার অবিচ্ছিন্ন অংশ হলো স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা পরিষেবা। সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসাবে বিভিন্ন দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি গৃহীত হয় এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসাবে – (১) ফিনল্যান্ডে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, (২) অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র সঙ্গতিহীন ব্যক্তি সামাজিক কল্যাণ তহবিল থেকে চিকিৎসার খরচ পায়, (৩) চীনে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলিতে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত মজুরি পাওয়া কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, (৪) কিউবায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, (৫) জাপানে স্বাস্থ্য বিমা মেটাতে সরকারী সাহায্য করা হয়, (৬) ফিলিপিন্সে চিকিৎসা পরিচর্যার জন্য সরকার পরিচালিত সামাজিক বিমা কর্মসূচী আছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্যনীতির পরিবর্তন শুরু হয়। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী বাতিল হওয়ার ফলে – শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, সংক্রমণ ব্যাধিতে মৃত্যুর হার উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায়। সাধারণের জীবনের মান নিম্নগামী হয়ে পরে। বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে রাশিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা অভিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে একই কারণে চীনের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। কয়েক দশক যাবদ চীনের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও প্রাইভেট পুঁজিগোষ্ঠীগুলির বিপুল আধিক্য বেড়েছে। সমাজতান্ত্রিক সাইনবোর্ডের আড়ালে সেখানেও 'চিকিৎসা একটি পণ্য' হয়ে গেছে।

ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা

ভারতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার চিকিৎসা পরিষেবা বিদ্যমান। WHO এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রই বেশি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা বলতে বাস্তবে প্রায় কিছু নেই। ফলে নাগরিকদের পকেটের জোরে চিকিৎসা কিনতে হয়। যারা অর্থবান তারা বেসরকারি স্বাস্থ্য বিমা করে রাখেন। ভারতের গ্রামে বসবাস করে ৬৮% নাগরিক অথচ গ্রামে রেজিস্টার চিকিৎসক মাত্র ২%। ২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতের ২৫% নাগরিকের কোন না কোন প্রকার স্বাস্থ্য বিমা আছে। ২০১৪ সালে ভারত সরকারের এক সমীক্ষায় ১৭% ভারতবাসীর স্বাস্থ্য বিমা থাকার তথ্য উঠে আসে। ভারতে স্বাস্থ্য বিমার সূচনা হয় Employment State Insurance Scheme (ESIS) এবং কেন্দ্রের Central Government Health Scheme [CGHS] এর মাধ্যমে। কিন্তু এর মাধ্যমে দেশের ১০% এরও কম মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পায়। ১৯৭৮ সালে Alma Ata ঘোষণায় ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। ১৯১৮ সালের ICSSR - ICMR প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ভারত সরকার জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ঘোষণা করে। ২০০২ সালে পরবর্তী জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ঘোষিত হয়। ২০০৫ সালে সূচনা হয় জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (National Rural Health Mission) বা NRHM। এই বছরেই চালু হয় শর্তাধীন নগদ হস্তান্তর প্রকল্প – "জননী সুরক্ষা যোজনা"। এই প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সন্তান প্রসবের জন্য বাড়ীর বদলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ানো। Annual Report on Vital Statistics of India (2013)-তে বলা হয়েছে – ২০১৩ সালে দেশে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার (১ বছর কম) বয়সী শিশু মারা গেছে। এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি (২২১৫৯) এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে (১৮৯৯২)। এই প্রকল্প চালু হওয়ায় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রসূতিদের আসার হার অনেকটা বাড়লেও প্রসূতি মৃত্যুর হার কিন্তু কমে নি। দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত জনসাধারণের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২০০৮ সালে চালু হয় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। পরবর্তীতে শুধু দারিদ্র সীমার নিচে নয়, অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে থাকা জনসাধারণকেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী বার্ষিক ৩০ টাকার বিনিময়ে নাম নিবন্ধীকরণ করলে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। সরকারি সমীক্ষায় জানা গেছে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত RSBY এর আওতায় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ পরিবার ছিল, কিন্তু চিকিৎসা নিয়েছে মাত্র ১ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষ এবং এই সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারত ৭ কোটি ২৮ লক্ষ পরিবার। ২০১৬ সালে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ১ লক্ষ পর্যন্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই প্রকল্প হৃদরোগ, ক্যান্সার, কিডনির চিকিৎসার ন্যায় উচ্চতর চিকিৎসার জন্য কাজ করে। কিন্তু দরিদ্রতম ৪৯% দেশবাসীর ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো – ফুসফুসে সংক্রমণ, ডায়রিয়া, যক্ষা সহ নানা জীবাণু ঘটিত সংক্রামক রোগ। এছাড়া ঔষুধ কেনা, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যয় RSBY প্রকল্পের মাধ্যমে

পাওয়া যায় না। তার উপর আছে যাতায়াত ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ। ২০১৫ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির খসড়ায় বলা হয়েছে যে মানুষের চিকিৎসার সমস্ত প্রয়োজনীয়তাকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত না করায় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বোঝা সামলাতে মানুষের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ছে।

দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত মানুষের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা চালু আছে। যেমন কর্ণাটকে – বাজপেয়ী আরোগ্যশ্রী (VAS) এবং যশস্বিনী কৃষক সমবায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প, অন্ধ প্রদেশে – রাজীব গান্ধী আরোগ্যশ্রী প্রকল্প (RAS), তামিলনাড়ুতে – মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প, মহারাষ্ট্রে – রাজীব গান্ধী জীবনদায়ী আরোগ্য যোজনা, গুজরাটে – মুখ্যমন্ত্রী আমৃত্যুম যোজনা, ছত্তিশগড়ে – সঞ্জীবনী কোষ প্রকল্প প্রভৃতি। ২০১৫ সালে CGHS, ESIS ও RSBY – সব মিলিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ছিল ২৮ কোটির কিছু বেশি মানুষ। মেঘালয় রাজ্য সরকার ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য সরকারের বা কেন্দ্র সরকারের কোন স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে পোলিও, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, এইডস, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু প্রভৃতি সংক্রমণ ব্যাধির চিকিৎসা পাওয়ার সরকারি ব্যবস্থা আছে। তথাপি রেজিস্ট্যান্ট টি বি রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গু উল্লেখ করা হয় না, কালাজ্বর, এনসেফালাইটিস প্রভৃতি সংক্রমণ ব্যধিতে মৃত্যুর হার কমে নি। অতি সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে বি আর ডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে অগাস্ট এই ৮ মাসে ১২৯৬টি শিশু মারা গেছে এনসেফালাইটিস সহ নানা সংক্রমণে। গত ৮ মাসে শুধু উত্তর প্রদেশেই মারা গেছে প্রায় দেড় হাজার শিশু।

বাস্তবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যাপ্ত নয়। যদি বা কোথাও স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তো চিকিৎসক নেই। ফার্মাসিস্টকে চিকিৎসকের কাজ করতে হয়। যদি বা কোথাও চিকিৎসক থাকে তো রোগ নির্ণয় করার পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, ঔষুধ নেই। রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। সাপে কাটা রোগীর জন্য গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে অ্যান্টিভেনাম নেই, টেকনিসিয়ান নেই, ভেন্টিলেশন নেই। কুকুর জাতীয় প্রাণীর কামড়ের চিকিৎসার জন্য সর্বত্র অ্যান্টির‍্যাবিস ইঞ্জেকশন নেই। শহরে সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর ভিড় উপচে পড়ছে। পর্যাপ্ত বেডের অভাবে ট্রলি, ট্রলির অভাবে মেঝেতে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রোগীর অনুপাতে চিকিৎসক নগণ্য। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পঠন-পাঠনে ভর্তি হওয়ার জায়গা ডাক্তারিতে অতি অল্প ভর্তির সীট এবং তাও আবার সঙ্কোচন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যাও নগণ্য। ১০০ জন রোগী প্রতি ১ জন নার্স। আয়াদের দিয়ে নার্সের কাজ করানো হয়। তথাপি শ্রমজীবী মানুষ যতটুকু (সরকারি) চিকিৎসা পরিষেবা পায় তা সরকারি হাসপাতালেই পায়। সরকার বছরের পর বছর চিকিৎসা খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করায়, সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় সৃষ্ট অব্যবস্থাই – বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে মুনাফা কামানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। টীকাকরণ, পরিবার পরিকল্পনার ন্যায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে ১ লক্ষ 'আশা' কর্মী, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের নন মেডিক্যাল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কর্মী, জরুরীকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ১৮ হাজারের বেশি কিছু অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা ক্রয় করার ক্ষমতা শতকরা কতজনার আছে? যখন একের পর এক সরকারি হাসপাতালে ঘুরে রোগীকে ভর্তি করা যায় না তখন নিরুপায় হয়ে শ্রমজীবী গরীব মানুষ প্রিয়জনকে সুস্থ করে তুলতে বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে শ্রমজীবীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী ও পরিবার দুই-ই সর্বস্বান্ত হয়। বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিটিতেই এবং প্রতি ক্ষেত্রেই Over Billing হয়। বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক ও পরিচালক কমিটির সদস্যদের রেফার করার জন্য, বিশেষ ঔষুধ লেখার জন্য, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলির দ্বারা পৃথক পৃথক ইনসেন্টিভ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এখানে চিকিৎসকে "টার্গেট" মাথায় রেখে পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হয়। ২০১২ সালের ২৭শে মে, বিখ্যাত অভিনেতা আমির খান, 'সত্যমেব জয়তে' নামক এক দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে – বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার খরচ বাবদ অত্যাধিক বিল বানান এবং অযথা অপ্রয়োজনীয় ঔষুধ ব্যবহার ও পরীক্ষা করানোর কথা উল্লেখ করেন। যারা বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা কিনতে যান তাদের বেশির ভাগই Over Billing-এর বিষয়ে অবগত এবং এদের বেশির ভাগেরই (বেসরকারি) স্বাস্থ্য বিমা করা থাকে। ফলে Over Billing-এর কিছুটা দায় স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানিকেও বহন করতে হয়। রোগীর মৃত্যু হলে কখনো কখনো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রোগীর পরিবারের সংঘর্ষ বাঁধে।

বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের মতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রধানত নির্ভর করে জনসচেতনা, যথেষ্ট চিকিৎসা পরিষেবা, নাগরিকদের কাছে সুলভে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া এবং চিকিৎসা

পরিষেবাকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করার উপর। **কিন্তু বর্তমান ভারতে ১৭০০ জন মানুষ পিছু ১ জন রেজিস্টার চিকিৎসক আছেন।** মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট – ১৯৫৬-র ঘোষিত লক্ষ্য ছিল আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য এম. বি. বি. এস ও তদুর্দ্ধ চিকিৎসক গড়ে তোলা। বাস্তবে বিগত ৭০ বছরে ভারতে আধুনিক চিকিৎসক তৈরি হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ এবং অপাশ করা চিকিৎসক তৈরি হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ। ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবার অবস্থানই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে চিকিৎসা একটি পণ্য এবং রোগী চিকিৎসা পরিষেবা দানে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক হলো ক্রেতা-বিক্রেতার।

গরীব শ্রমজীবী মানুষের আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায়, দামি ঔষুধ কেনার ক্ষমতা না থাকায় এবং চিকিৎসককে পর্যাপ্ত ফিস দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের বেশিরভাগই গ্রামীণ শ্রমজীবী অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন না। এর অভাব কিছুটা পূরণ হয় অপাশ করা চিকিৎসা পেশাজীবীদের দ্বারা। এরা তুলনামূলক কম ফিসে এবং রোগীর আর্থিক সঙ্গতির দিকটা বিবেচনা করে ঔষুধ দেন। ব্যাপক গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ এদের দ্বারাই প্রাথমিক চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। এদের বেশির ভাগই অনুশীলন শুরু করার পর ঔষুধ কোম্পানীর ঔষুধ বিক্রির বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রশিক্ষিত হতে থাকেন এবং ঔষুধ ও প্যাথলজি টেস্টের ব্যবসা দিব্যি চলতে থাকে। রাষ্ট্র সংঘ এই সব অপাশ করা চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার দ্বৈত ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথি, ইউন্যানি, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

"যোজনা" মার্চ ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এবছর বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৩৩,৫৩৩ কোটি টাকা, আর এবছর বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০,২৮৩ কোটি টাকা। রোগ নির্মূল কর্মসূচীর মধ্যে আছে – (১) ২০১৭ সালের মধ্যে কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া নির্মূল করণ, (২) ২০১৮ সালের মধ্যে কুষ্ঠ নির্মূল করণ, (৩) ২০২০ সালের মধ্যে হাম নির্মূল করণ, (৪) ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করণ প্রকল্প। ২০১৭ সালে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতিসম্প্রতি নীতি আয়োগ – কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক একত্রে জন স্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে যাতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ নিয়োজিত হবে। এই প্রসঙ্গে "যোজনা" জুলাই ২০১৭ সংখ্যায়, "স্বাস্থ্য সুরক্ষা – ছত্রছায়ায় আনতে হবে সবাইকে" শীর্ষক রচনায় Tata Institute of Social Science এর প্রফেসার কে সিতা প্রভু লিখেছেন, "সমস্ত বিষয়টিতে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে না এগোলে সরকারের দেওয়া ভর্তুকির সুযোগ নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলি ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও বলছে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকলে তবেই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলি সঠিক দিশায় কাজ করতে পারে এবং এই কাজ শুধুমাত্র সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, "সকলের জন্য স্বাস্থ্য"-র ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে সরকারকেই প্রথমে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতে হবে।" "Do we Care, India's Health System"– ২০১৭ রচনায় সুজাতা রাও এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য অর্থ সংস্থান কীভাবে এবং কতটা হওয়া উচিত তার একট রূপরেখা চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১-১.৫%, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১% ব্যয় করতে হবে। অতিরিক্ত ২% প্রয়োজন ব্যবহার যোগ্য শৌচালয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ও আবাসনের মতো সহায়ক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে।

বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করেছে তাতে সেই রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হয় নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়মেই অর্থাৎ উৎপাদনের লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের নাগরিক তথা বিশ্বের সমস্ত মানুষের চিকিৎসা প্রাপ্তি নির্ভর করে। কোন ব্যবস্থায় প্রণিত আইন সেই ব্যবস্থাকেই সেবা করে। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালের "CLINICAL ESTABLISHMENT" আইন – আজও দেশের বেশির ভাগ মানুষকে চিকিৎসা দিতে পারে নি। কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংবিধানেরই নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয় নি। তাই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বন্ধ এবং আইনের মাধ্যমে সকলের চিকিৎসাপ্রাপ্তি অলীক কল্পনা মাত্র। যদি বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বন্ধ করা সম্ভব হয় তবে রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হবে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রাইভেট ব্যবসা চলবে।

বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমগুলি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে অব্যবস্থার জন্য দায়ী বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আড়াল করতে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দায়ি করে। এই প্রসঙ্গে "সুস্বাস্থ্য" ১লা এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় **ডাঃ স্বপন কুমার জানা**

"চিকিৎসা পরিষেবায় অনাচার, দিশেহারা স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা" শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় লিখেছেন, "কর্পোরেট হাসপাতালের চিকিৎসা আজ মালিকের স্বার্থ রক্ষাকারী চিকিৎসকদের হাতে। চিকিৎসকরা কার্যত স্বাস্থ্য শিল্পের মালিকদের "মজুরি ভোগী শ্রমজীবী" কর্পোরেট হাসপাতালের যাবতীয় অনাচারের দায়িত্ব তাই চিকিৎসকদের নয় – কর্পোরেট মালিকদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এক শ্রেণীর চিকিৎসক ব্যবসায়ী মানসিকতা নিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছেন।"

অন্যান্য "বিমা"-র ন্যায় স্বাস্থ্য বিমাও একটি ব্যবসা। ব্যবসা সর্বদা নির্দয় এবং কখনোই জনকল্যাণমুখী হতে পারে না। তাই স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্যা দূর হওয়া সম্ভব নয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা যেহেতু বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সেই হেতু চিকিৎসা ব্যবস্থার যা কিছু দুরাবস্থা তা বিদ্যমান অর্থনীতিরই প্রতিফলন মাত্র। সংস্কারের মাধ্যমে যেহেতু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না তাই শত সংস্কারের দ্বারা বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরাবস্থা দূর করতে, সমাজ বিকাশের নিয়মে বর্তমান সমাজের গর্ভে যে সমাজবাদী সমাজের ভ্রূণ পরিপক্ক হয়েছে তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার বাধাগুলি দূর করাই বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়। সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই বর্তমানে জনসাধারণের সকল সমস্যাগুলি সমেত চিকিৎসা সমস্যারও সমাধান সম্ভব হবে। কারণ সমাজবাদী সমাজে উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা নয়, লক্ষ্য হলো শ্রমজীবীদের প্রয়োজন সামাজিকভাবে মেটানো।

সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে সমাজ সচেতন মানুষের করণীয় কী?

আলোচনা থেকে এটা বেড়িয়ে এসেছে যে এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যান্য দেশের চিকিৎসার হালের ন্যায়। পার্থক্য ঊনিশ-বিশ। মুনাফার লক্ষ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা 'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই দাবিকে স্বীকার করে না। দেশের সরকারি-বেসরকারি সব চিকিৎসা ব্যবস্থাই একই নীতিতে চলছে। দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই সরকারি মদতে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির রমরমাও চলছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষ তাই বিজ্ঞাপণের প্রলোভনে অলৌকিক চিকিৎসা, জ্যোতিষীর কাছে ছুটছেন। তাবিজ-কবজ-শিকড়-বাকড়ের ব্যবসা রমরমা হচ্ছে, দেবতার স্থানে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

বিজ্ঞান কর্মী তথা সমাজ সচেতন মানুষকে তাই জনতার মধ্যে গিয়ে স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার এই সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে হবে। সমস্ত অবৈজ্ঞানিক-অলৌকিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অবসানের জন্য পথে নামতে হবে। প্রাইভেট চিকিৎসা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সরকারকে চিকিৎসার সমগ্র দায় বহন করার দাবি তুলতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্ত ব্লক স্তরের হাসপাতালে জনসংখ্যার অনুপাতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক নিয়োগ; ফার্মাসিস্ট-নার্স-আয়া সহ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, প্যাথোলজি-রেডিওলজি সহ সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুপাতে গড়ে তোলা, পর্যাপ্ত বেড, ঔষধ, পথ্য-র ব্যবস্থা গ্রহণ; হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখার জন্য পর্যাপ্ত সাফাই কর্মী, শৌচালয় গড়ে তোলা; রুগীকে আনা-নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স সহ সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদানের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এছাড়া গ্রাম-শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা, প্যাথলজির ব্যবস্থা, বেডের ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা চালুর জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক গড়ার জন্য মেডিকেল কলেজ খুলতে হবে। প্রশিক্ষিত নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মী গড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই আন্দোলন-সংগ্রামের বিকাশই 'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই দাবি পূরণের প্রাথমিক ধাপ।■

হিন্দুত্ববাদীদের কঠোর সমালোচক গৌরি লঙ্কেশকে গুলি করে হত্যা করল অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা

হিন্দুত্ববাদীদের কঠোর সমালোচক কর্নাটকের যুক্তিবাদী সাংবাদিক এবং কন্নড় সাপ্তাহিক 'লঙ্কেশ পত্রিকা'র সম্পাদক গৌরি লঙ্কেশকে (৫৫) গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা বেঙ্গালুরুতে তার বাসভবনের সামনেই গুলি করে হত্যা করেছে। এই ঘটনার পর বেঙ্গালুরু, দিল্লি, চেন্নাই, পাটনা, আমেদাবাদ, মুম্বাই কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অন্যদিকে সোস্যাল মিডিয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা ব্যাপক উল্লাস প্রকাশ করেছে। বাধ্য হয়ে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা লঙ্কেশ হত্যার রুটিন প্রতিবাদ করেছেন এবং খুনিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন।■

সোভিয়েত রাষ্ট্রে আপতকালীন চিকিৎসা

– ডাইসন কার্টার

[২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাকে এক অভূতপূর্ব মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও বর্তমান পৃথিবীতে তখনকার পরিষেবা পদ্ধতি ও গবেষণাগুলির অনেকটাই আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তন হয়ে গেছে, তবুও প্রকৃত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনের মূল্য ও তা রক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাগিদ কিরকম হতে পারে, কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এ সম্পর্কে পাঠকবর্গকে অবহিত ও সচেতন করার প্রয়াসে বৃটিশ **সাংবাদিক ডাইসন কার্টারের** তৎকালীন সময়ে লেখা প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো – বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জিত হয়েছিল এই রচনা তার একটা খন্ড চিত্র – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

বেশ কয়েক বছর আগে জনাকয়েক ইংরেজ ডাক্তার মস্কোর এক হাসপাতাল দেখতে যান। তাঁরা লন্ডনে ফিরে খুব উৎসাহের সঙ্গে কি দেখেছেন তার বিবরণ দিতে থাকেন। কেউ কিন্তু তাতে কান দিল না। যারা বর্ণনা পড়ল তারা বলল 'আরো এক দফা রুশ প্রচার।' এবার আসল ব্যাপার প্রকাশ হচ্ছে। বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক চিকিৎসকদের ঐ হাসপাতাল দেখানো হয়েছে। এবারকার বিবরণীগুলি মনোযোগের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে কারণ সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন যে বিজ্ঞানের এক অঙ্গ, এই ভেষজ-বিদ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্চর্যরকম এগিয়ে গেছে।

একথা বুঝবার জন্য ডাক্তার হবার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি ঐ হাসপাতাল দেখতেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই আপনিও ধরতে পারতেন রুশ চিকিৎসাবিদ্যায় কি ঘটেছে। কিন্তু মস্কোয় যাবার আমাদের সুবিধা নেই। তাই এছাড়া সব থেকে ভালো পন্থা হিসাবে আমরা একটা কাল্পনিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারি।

মস্কো কেন্দ্রীয় 'এমারজেন্সি' হাসপাতালের বাড়িটা চমৎকার। দেখলে হাসপাতালের চেয়ে প্রাসাদ বলেই ভুল হয়। এর গঠন অন্য রকম হলেও চলত কারণ এই ধরনের হাসপাতালের চেহারা দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। এর নামেই প্রমাণ যে এই হাসপাতালে শুধু অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেরই ব্যবস্থা হয়। হঠাৎ দুর্ঘটনায় আহত অথবা হঠাৎ রোগাক্রান্ত মানুষেরই এখানে চিকিৎসা হয়। এই ধরনের রোগীর জন্য বিশেষ হাসপাতালের কি প্রয়োজন? রাশিয়ার ডাক্তারেরা এই উত্তর দেন – 'আকস্মিকতার ক্ষেত্রে মানুষের জীবন অনেক সময় কয়েক মিনিট, এমন কি কয়েক সেকেণ্ডের এদিক ওদিকের ওপরে নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে জীবন রক্ষার অর্থ – ঠিক কি কর্তব্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান, কর্তব্য পালনের উপযোগী সরঞ্জাম হাতের কাছে থাকা আর তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলা। 'এমারজেন্সি ওয়ার্ড' থাকলেও সাধারণ হাসপাতাল যথেষ্ট নয়। আমরা একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ দুর্ঘটনার কারণ থেকে শুরু করেছি আর তার ভিত্তিতেই নূতন চিকিৎসার সংগঠন গড়ে তুলেছি।'

ধরুন আপনি মস্কোর কোনো সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সাক্ষী। রাস্তার একটি গাড়ির সামনে এসে পড়েছেন ধরুন কোনো বৃদ্ধা। আপনি হয়ত সামনের কোনো ওষুধের দোকানে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। আপনি মস্কোতে যার কাছেই খবর দিতে যান না কেন – সে পুলিশ, ডাক্তার বা হাসপাতাল যাই হোক – টেলিফোন পরিচালক আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতালের লাইন দেবে। সেখানকার টেলিফোন পরিচালিকা মন দিয়ে সব কথা শোনেন। তিনি গলার স্বর থেকে মানুষের মন বোঝার ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। আপনার কথা বলার ভঙ্গী থেকে তিনি তখনই বুঝতে পারেন যে সত্যই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, হয়ত বেশ খারাপ রকম দুর্ঘটনাই। আপনাকে বাধা না দিয়েই তিনি একটি সুইচ্ টেপেন। দু'তলা নিচে হাসপাতালের পিছনে রাস্তার উপরকার গ্যারেজে লাল আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠে আর ঘন্টা বাজে। মস্ত লম্বা সারির থেকে একটি দ্রুতগামী অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চালক মোটর স্টার্ট করেন। বিশ্রাম কামরা থেকে দু'জন ডাক্তার দৌড়ে আসেন অ্যাম্বুলেন্সের দিকে। দশ সেকেন্ড পরে টেলিফোন পরিচালিকা দুর্ঘটনা কোথায় হয়েছে তার ঠিকানা জেনে রেডিও মারফৎ অ্যাম্বুলেন্সকে জানায় আর গাড়ি চলতে শুরু করে।

বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটায় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসপাতালের নিয়মে টেলিফোনের ডাক ও অ্যাম্বুলেন্সের প্রস্থানের মধ্যে দু মিনিটের বেশি সময় লাগতে পারে না। এর বেশি লাগলে তাই নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। একটি অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গেলে আর একটি তার জায়গা নেয় আর আরো দুজন

ডাক্তার পরের ডাকের জন্য প্রস্তুত হন।

মস্কোর কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতাল এই আশ্চর্য ব্যাপার। এর মন্ত্র হচ্ছে ঃ 'প্রাণরক্ষা ও যন্ত্রণা উপশম।' এই হাসপাতালে আছে ৭০০ বেড। ১০০ জন ডাক্তার সব সময়ে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকেন আর সমসংখ্যক ডাক্তার থাকেন 'রিজার্ভে'। এই সব নিয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল শান্তির সময়েও বছরে ৬০,০০০টি আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা করে। এই বিপুল সংখ্যক দুর্ঘটনার সঙ্গে তাল রাখবার জন মস্কো হাসপাতালকে অভ্রান্তসন্ধানীদের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করবার উপযোগী করে সংগঠিত করতে হয়েছে।

টেলিফোন পরিচালিকা ও অ্যাম্বুলেন্সচালক নিয়েই এ সংগঠনের আরম্ভ। মস্কোর প্রত্যেক পাড়া ও রাস্তা এদের নখদর্পণে। পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্র আছে একটি হাসপাতালে আর চারটি মস্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ক্ষিপ্র কাজ করা প্রয়োজনীয় বলে বহু গাড়ির ব্যবস্থা আছে আর টেলিফোন পরিচালিকা সুইচ্ মারফৎ দুর্ঘটনার নিকটতম কেন্দ্রে সংকেত পাঠায়।

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার পর কেন্দ্রীয় হাসপাতালের টেলিফোন পরিচালিকা যিনি ফোন করছিলেন তাঁর কাছ থেকে আরো বিবরণ পেতে চেষ্টা করেন। রেডিও মারফৎ এ সব খবর যে ডাক্তাররা 'কলে' গেছেন তাঁদের জানানো হয়। তারপর 'অপারেশন' ঘরেও খবর দেওয়া হয় যাতে রোগী যখন পৌঁছয় তখন যেন যে ডাক্তার ও যন্ত্রপাতির দরকার তা তৈরী থাকে।

মস্কো হাসপাতালে 'হাত পাকানোর' সুবিধা নেই। কর্মচারীর তালিকায় নাম তুলতে হলে ডাক্তারকে দশ বৎসর কোনো বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। ধারণা হল এই যে আকস্মিকতার সঙ্গে যুঝতে হলে সব থেকে বেশি দক্ষতার প্রয়োজন। মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসক, স্নায়ুবিশারদ, অস্থি বিশেষজ্ঞ, অভ্যন্তরীণ রোগ-চিকিৎসকগণ, রোগ-নির্ণয়বিদ সবারই প্রাণরক্ষার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ। বৃটিশ সামরিক অস্ত্র-চিকিৎসকদের মতে এই হাসপাতালের সরঞ্জাম শুধু আকস্মিক দুর্ঘটনার পক্ষে নয়, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করবার জন্য পরে জটিল অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার পক্ষেও অপর্যাপ্ত ও অতুলনীয়। এই হাসপাতালেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

রক্ত দেবার সুপরিচিত ব্যাপারটাই ধরা যাক। সমস্ত দুনিয়ায় হাসপাতাল বা যুদ্ধক্ষেত্রের কাজের সুবিধার জন্য মানুষের রক্ত জমিয়ে বা শুকিয়ে রাখা হয়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা বেশ সাম্প্রতিকই বলা চলে। রাশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এর সূত্রপাত। রক্ত সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে মস্কো হচ্ছে সর্ববাদিসম্মত প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য দেশকে এদিকে সে বহু পিছনে ফেলেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সাংঘাতিক রকম রক্তস্রাবী দুর্ঘটনাক্রান্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলে তাকে জীবিত লোক থেকে নেওয়া জমানো রক্ত না দিয়ে সোজাসুজি মৃত ব্যক্তির রক্ত দেওয়া হতে পারে। ধরুন এমন একজন লোকের রক্ত যিনি আগেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।

এই বিস্ময়কর নূতন কৌশল আজ অসংখ্য রুশ জীবন রক্ষা করছে। এই পদ্ধতিটি মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল কোনো কোনো মৃত্যুর ক্ষেত্রে রক্ত অন্যান্য রক্তের চেয়েও অনেক বেশি নিরাপদ ও অন্যের দেহে দেবার উপযুক্ত। যখন কোনো লোক কোনো যন্ত্রণা ভোগ না করে মুহূর্তের মধ্যে মারা যায় তখন তার দেহ থেকে উপযুক্ত উপায়ে রক্ত নিলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে কোনো রকমের মৃত্যুর মতই প্রথমে রক্ত জমে যায় কিন্তু শীঘ্রই আবার তা তরল হয়ে যায়। আর কোনো রাসায়নিক পদার্থ না মেশালেও সেটি তরল থেকে যায়। এই জন্য ও আরো অনেক কারণে অন্য দেহে যোগান দেবার পক্ষে এবং রুগ্ন বা আহত ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য মৃত ব্যক্তির রক্তই সব থেকে ভালো।

রুশ ডাক্তারেরা ফ্রন্টে এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন। কিভাবে তা হচ্ছে সে হল সামরিক গুপ্ত খবর। বৃটিশ ও মার্কিন চিকিৎসকদের কাছে পন্থাটি প্রকাশ করা হয়েছে। যা দেখেছেন তাই নিয়ে তাঁরা খুবই আগ্রহশীল। যাঁরা মারা গেছেন তাঁদেরই সাহায্যে মুমূর্ষু নরনারীকে 'যমের দুয়ার' থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে বীরেরা প্রাণ দিচ্ছেন তাঁরাই অন্য নবজীবনপ্রাপ্ত মানুষের দেহে পুনর্জীবন লাভ করেছেন। নিশ্চয়ই এর চেয়ে বীরত্বমণ্ডিত অমরত্বের কথা কেউ কখনো ভাবতে পারেনি!

কেন্দ্রীয় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞেরা যুদ্ধ সংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পথ দেখিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার বৈপ্লবিক উপায়টির কথাই ধরুন। এ সবেরই সূত্রপাত কেন্দ্রীয় হাসপাতালে। পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে সাংঘাতিক বৈদ্যুতিক 'শকের' রোগীকে যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করা উচিত। অ্যাম্বুলেন্স কারিগরেরা অমনি লাগল কাজে। আর অদ্ভুত চাপ লাগানো এক রকম 'স্ট্রেচার' বানালো যাতে রোগী যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আলগা করে বেঁধে আস্তে তুলে নিতে পারে।

সামরিক চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে কারখানামুখো দৌড়লেন। সেখানে তৈরী হল উদ্ধার করার ট্যাঙ্ক। এই আশ্চর্য অ্যাম্বুলেন্স প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যে অনায়াসে ঢোকে, আহত মানুষের ঠিক উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় (চাকার মত কলে তাকে বেঁধে ফেলে), যন্ত্রের পেটের কাছে একটা লুকোনো দরজা খুলে সৈন্যটিকে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ভারী ভারী অস্ত্র সজ্জায় ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি উদ্ধারকারীরা ভিতরের আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে থাকে।

আপনার আমার হয়ত কখনো মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালের 'বৈদ্যুতিক শক রোগীর স্ট্রেচার' না লাগতে পারে। কিন্তু আর একটি আবিষ্কার আমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। এটি হল অস্ত্রোপচারকে যন্ত্রণামুক্ত করবার নূতন এক পদ্ধতি। কোনো কোনো বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা অস্ত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্মের পরে একেই সব থেকে বড় আবিষ্কার বলে মনে করেন।

আপনাকে কখনো স্থানীয় 'এ্যানেসথেটিক' ব্যবহার করতে হয়েছে কি? যেমন ধরুন দন্তচিকিৎসক দাঁত তুলবার আগে যে প্রক্রিয়ায় জায়গাটা অসাড় করে নেন বা নাকের উপর যখন ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হয়।

১৯৪০ সালে বিখ্যাত সোভিয়েত অস্ত্র চিকিৎসক ভিস্‌নেভস্কি এই সুপরিচিত 'এ্যানেসথেসিয়া' গুরুতর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার সূত্রপাত করলেন। তাঁর কৌশলটা নূতন ধরনের। তিনি চামড়ার তলায় খুব কম মাত্রায় নোভোকেন ও পারকেন ইনজেকশান করতে লাগলেন। যতই মাংস অসাড় হতে লাগল ততই ইনজেকশান দিয়ে ভিসনেভস্কি দেখলেন যে বেশ অনেকটা জায়গা অসাড় করে ফেলা যায়। ছুঁচের মুখের চারিদিকে এই আরামপ্রদ ওষুধের কাজ হতে থাকে।

ভিসনেভস্কির প্রক্রিয়ায় কোন যন্ত্রণা নেই। দুমিনিটের মধ্যেও এতে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনার রোগীও আরাম পায়। বমনের ইচ্ছা বা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি পরবর্তী উপসর্গও এতে নেই। সব থেকে বড় কথা অস্ত্রোপচারের পরে অনেক সময়ই যে স্নায়বিক আঘাত ঘটে তা এতে অনেকখানি কমে যায়।

গত বছর সোভিয়েত রসায়নবিদরা ভিসনেভস্কিকে 'সভকেন' নামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি নূতন ওষুধ দিয়েছিল। এর এক ফোঁটা ১০,০০০ ফোঁটা জলের সঙ্গে মেশালেও এতে কাজ হয়। কোনো ক্ষতি না করে একজন মানুষকে কয়েক পাঁইট এই জিনিস ইনজেকশন দেওয়া যায় জায়গাটা অসাড় থাকে চার থেকে ছঘন্টা।

ভিসনেভস্কি পন্থা এত আশ্চর্য রকম সাফল্যলাভ করল যে এখন এটি মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালে হাড় ভাঙা, হাড় কেটে বাদ দেওয়া, পেটে অস্ত্রোপচার, ক্যানসার প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যখন কোনো অঙ্গ বাদ দেবার দরকার হয় সভকেন দিনের পর দিন জায়গাটাকে অসাড় রাখে যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষতটা বেশ সেরে আসে।

যুদ্ধে আহতদের পক্ষে ভিসনেভস্কির পন্থা আশ্চর্য জনক। ফিনল্যান্ড অভিযানের যে লড়াই নিয়ে বহু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তাতেই সভকেন দ্রুত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছিল অথচ তার ফলে সৈন্যরা অসুস্থ বা অসহায় হয়ে পড়েনি। একই রকম অবস্থায় যখন সাধারণ 'অ্যানেসথেসিয়ার' পাশাপাশি এর পরীক্ষা হল তখন দেখা গেল যে ভিসনেভস্কি প্রক্রিয়ায় ক্ষত থেকে মৃত্যুর হার শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে।

মিত্রশক্তিপুঞ্জের চিকিৎসকেরা যে এই সোভিয়েত পন্থা কাজে লাগাতে উৎসুক এ কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি রাষ্ট্রদূত মায়েস্কি ও লর্ড হর্ডার ঠিক এই ধরনের সহযোগিতার জন্যই ইঙ্গ-সোভিয়েত মেডিক্যাল কমিটি গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। কমিটি যাতে ভালোভাবে কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য মায়েস্কি এই উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়ে চিকিৎসকদের অবাক করে দেন ঃ 'আপনারা না জানতে পারেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার আজীবন কৌতূহল আছে।' এরপর তিনি হেসে বলেন ঃ 'আমার পিতার গবেষণাগারে যখন থেকে গিনিপিগদের খাওয়ানো ও পরিষ্কার রাখার ভার আমার উপরে ছিল তখন থেকেই!'

বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্রচিকিৎসক রস্কো ক্লার্ক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বললেন ঃ 'ইতিহাসের গতিই বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাসের পর্দা ছিল তা বহুলাংশে অপসারিত করেছে আর আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে এমন কোনো কোনো জিনিস, যা রক্ষার জন্য সোভিয়েতের মানুষ প্রাণপাত করছে।'

'কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতালে' যা কিছু আশ্চর্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সবারই ফিরিস্তি এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একটি আধুনিকতম উন্নতি ঘটেছে মাতৃত্ববিদ্যা সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় হাসপাতালে একটি 'এমারজেন্সি' মাতৃত্ব বিভাগ আছে। এর কাজ আকস্মিক ও কষ্টকর প্রসবের সম্পর্কে। এখানেই সোভিয়েত চিকিৎসকেরা জরায়ুর রক্ত কাজে লাগাবার পন্থা আবিষ্কার করেন। এতদিন প্রসবের পর মাতৃদেহ এই খাঁটি ও প্রয়োজনীয় রক্ত থেকে বঞ্চিত হত। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র এই জরায়ুর রক্ত বাঁচানো হয়। অন্য দেহে চালান দিয়ে প্রাণরক্ষায় সাহায্য হয়। মৃত ব্যক্তির রক্ত ব্যবহার

সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল মনে আছে তো? কাজেই একথা আক্ষরিক সত্য যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সোভিয়েত চিকিৎসাবিজ্ঞান মূল্যবান মনুষ্যজীবন রক্ষা করে।

সম্প্রতি সোভিয়েত রক্ত সম্পর্কিত গবেষণা একটা আশ্চর্য রকম মোড় নিয়েছে। আপনারা জানেন নানা ধরনের রক্ত আছে। সোজাসুজি এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্ত চালান করতে হলে যিনি দিচ্ছেন তাঁর রক্ত রোগীর রক্তের সমপর্যায়ের হওয়া চাই। বিভিন্ন ধরনের রক্ত মিশ্রণ বিপদজনক। কিন্তু এ সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে করতে ডাঃ স্পাশু কুকোট্স্কি আবিষ্কার করেন যে খুব স্বল্পমাত্রায় (দু তিন চামচ) বিভিন্ন পর্যায়ের রক্ত কোনো কোনো রক্তদোষের ব্যারামে দেওয়া চলতে পারে।

এরই সূত্র ধরে ডাঃ ব্যাগ্ডাসারোভ গুরুতর পাকস্থলীতে ক্ষত রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। পরে তিনি ছাগলের রক্ত ব্যবহারেরও চেষ্টা করেন। ৩০০ ক্ষেত্রে এতে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। যন্ত্রণা, রক্তপাত ও অন্যান্য উপসর্গ সম্পূর্ণ দূর হল ও ক্ষতও একেবারে সেরে গেল। চর্মক্ষত নিয়েও এ ধরনের কাজ চলছে।

হাসপাতাল বা ডাক্তারদের সম্পর্কে কোনো সিনেমা দেখে থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অস্ত্রোপচারের আগে চিকিৎসকেরা কত সযত্নে তাঁদের সমস্ত হাত ধুয়ে নেন। এর উদ্দেশ্য জীবাণু দূর করা। এইভাবে রোগীর কাপড়জামা তোয়ালে একটা উনুনের মত জিনিসে কয়েক ঘন্টা রেখে সম্পূর্ণভাবে জীবাণু মুক্ত করতে হয়। অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও এ কথা খাটে। অবশ্য যথেষ্ট সরঞ্জামওয়ালা হাসপাতালে এসব করা শক্ত নয় কারণ সেখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কি হয়? খুব সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সময়ই বা কি করা হয়? সেখানে হাত ধোয়া বা জীবাণু মুক্তি প্রক্রিয়ায় কালক্ষেপ করার চেয়ে ডাক্তাররা বরঞ্চ রোগীর ছোঁয়াচ লাগার আশঙ্কার সম্মুখীন হন।

মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালের ডাঃ এ এস ড্যাভ্লেটভকে এ ধরনের ব্যাপার সন্তুষ্ট করতে পারল না। তিনি চাইলেন দ্রুত জীবাণু নষ্ট করবার শক্তি আয়ত্ত করতে। বহুদিন ধরে এ সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সবশেষে তিনি এক মামুলি রাসায়নিক পদার্থ – হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি একটি নোংরা জীবাণু ভরা জলের মত জিনিসে হাত ডোবালেন, তারপরে ফের আবার ডোবালেন স্বল্পমাত্রার অ্যাসিডে। তিন মিনিট পরে কোনো ধোয়া পোঁছা না করেও চামড়ার উপর একটাও জীবাণু পাওয়া গেল না। বিশ মিনিটে অ্যাসিড যন্ত্রপাতিকে জীবাণু-মুক্ত করল। এই আবিষ্কারটি নিয়ে সযত্নে পরীক্ষা চালানো হয়। এখন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রাশিয়ার শহরের হাসপাতালগুলিতেও এর ব্যবহার চলছে। অস্ত্রোপচার ব্যাপারটা এতে অনেক সহজ হয়ে গেছে।

দুটো কারণে আমি ড্যাভ্লেটভের ঐ আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করছি। এতে আমাদের দেশের যোদ্ধাদেরও প্রাণ রক্ষার সাহায্য হতে পারে। আর এ থেকে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে বৈশিষ্ট্য হল সহজের সন্ধান। বারবার আপনারা দেখতে পাবেন যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জটিল ও বহু খরচের পন্থা থেকে সরে এসে সহজ ও সস্তা উপায়ের খোঁজ করতে করতে মস্ত বড় আবিষ্কার করেছেন। কেন? রাশিয়ায় কি ওরা পয়সা বাঁচাচ্ছে?

ড্যাভ্লেটভের জীবাণু-মুক্তির প্রক্রিয়াটাই ধরুন। এতে প্রায় কোনো যন্ত্রপাতিই লাগে না। আজকাল আমাদের হাসপাতালে জীবাণু মুক্তির যন্ত্রপাতির জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ হয়। বড় বড় কোম্পানিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য হল সাধারণত হাসপাতাল, অফিস, কারখানা ও সৈন্যবাহিনীর জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো, কারণ দর যত চড়বে কোম্পানির মুনাফাও তত ফেঁপে উঠবে। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হাসপাতাল, অফিস, কারখানা ও সৈন্যবাহিনীতে উত্তরোত্তর জটিল ও দামী সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা হয় যে ঐ সব জিনিস সহজ জিনিসের চেয়ে 'বেশি বৈজ্ঞানিক' কিন্তু এ কথা ঠিক হবেই এমন কোনো কথা নেই। চিরদিনই বিজ্ঞানের অন্যতম ধ্রুব লক্ষ্য হচ্ছে জিনিসকে সহজ করা। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে সবাই বুঝেছে।

সেখানে বৈজ্ঞানিকরা মোটা মুনাফালোভী বড় বড় কোম্পানির জন্যে কাজ করে না। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কাজ করেন সমগ্র জাতির জন্য। কাজেই তাঁরা চান যাতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর কাছে গিয়ে পৌছায়। তাই তাঁরা সর্বদাই সোজা জিনিস ও কম দামের জন্য চেষ্টা করেন।

ড্যাভ্লেটভের জীবাণু-মুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই চিকিৎসকের লক্ষ্য ছিল মানুষের প্রাণ, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের প্রাণ বাঁচানো। কোনো টাকাওয়ালা শিল্পপতির নজর জটিল যন্ত্রপাতির দিকে ফেরানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর পদ্ধতি এত সহজ যে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ হয়েও এর মর্ম বুঝতে পারে – যুদ্ধের সময় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার বেলায় বা শান্তির সময়ে কৃষিক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনার সময় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

এই ধরনের উন্নতির ফলে লাল ফৌজের চিকিৎসা বিভাগ আজ বলতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুপাতে এ যুদ্ধে পেটে আঘাত লাগার জন্য মৃত্যু শতকরা ৩৩ ভাগ ও মেরুদন্ডের আঘাতের ফলে মৃত্যু শতকরা ৮০ ভাগ কমেছে। চোয়াল আড়ষ্ট হওয়ায় বা বিষাক্ত পচা ক্ষতের রোগী আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। আগেকার যুদ্ধে এই দুই ছিল সব থেকে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিদের অন্যতম। আর ভিতরকার বিস্তৃত খবর সামরিক কারণে গোপন রাখা হলেও একথা জানা যায় যে সোভিয়েত ডাক্তারদের মুঠোয় আছে ইউরোপের সব থেকে ভয়াবহ ব্যাধি টাইফাসের প্রতিষেধক ব্যাপকভাবে তৈরি করার কৌশল।

মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতাল ছাড়বার আগে আরো একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার। এঁর নাম ফিলাটভ। হয়ত এঁর ছবি আপনারা কাগজে দেখেছেন। রাশিয়া আমাদের মিত্রশক্তি বলে গণ্য হবার পর ফিলাটভ হঠাৎ সারা জগতে বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন।

তাঁর ক্ষমতা আলোক সামান্য। এই অস্ত্র-চিকিৎসক এমন সব কাজ করছেন যা কেউ কখনো সম্ভব বলে ভাবতে পারেনি। যেমন তিনি অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে রাশিয়ায় কেমন করে মৃত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে মুমূর্ষুকে বাঁচানো হয়। ডাঃ ফিলাটভ চোখ নিয়েও তাই করেন। তিনি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে চোখ তুলে নিয়ে জীবন্ত লোকের দেহে বসিয়ে দেন আর তারা চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে!

(এখন পর্যন্ত এ ধরনের অস্ত্রোপচার কয়েকটি বিশেষ ধরনের অন্ধতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আরো খবর পেতে হলে ডন সোসাইটি, সান ফ্রানসিসকো, ক্যালিফোর্নিয়াতে চিঠি লিখতে পারেন। সেখানকার ডাক্তারেরা ফিলাটভ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করছেন।)

ডাঃ ফিলাটভ চিকিৎসা জগতে 'ভ্রূণতত্ত্ববিদ' হিসাবে বিখ্যাত। পশুরা ভূমিষ্ট হবার আগে গর্ভের ভিতরে কিভাবে বেড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সম্ভবত তিনি পৃথিবীর সব থেকে বড় পণ্ডিত। তিনি বিশ্বাস করেন চোখের মতই মানুষের দেহের অনেক অংশ এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। তাঁরই এক ছাত্র, ডাঃ ওকুনেভ দাঁত নিয়ে ইতিমধ্যেই এ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি ছোটদের 'দাঁত' জমিয়ে রেখে বড়দের চোয়ালে তা বসিয়ে দেন। সেখানে তুলে ফেলা দাঁতের জায়গায় এই নতুন দাঁত বেড়ে উঠতে থাকে। বাঁধানো মরা দাঁতের বদলে আপনি পান জীবন্ত দাঁত!

ফিলাটভ মৃত সৈনিকের দেহ থেকে জীবন্ত আহত মানুষের দেহে স্নায়ু লাগাবার উপযোগী অস্ত্রোপচারের কথা হালে ঘোষণা করেছেন। কাজেই তিনি এমন সব মানুষকে প্রাণ দিচ্ছেন যারা আগে হয় মারা যেত নয়তো অসহায় পঙ্গু জীবনযাপন করত। এইসব অস্ত্রোপচার দেখে বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক অস্ত্রচিকিৎসকেরা ফিলাটভ পদ্ধতির সরলতায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন শোনা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাপীড়িত মানুষের মনে এই অবিষ্কার নূতন আশার সঞ্চার করেছে।

এইবার 'মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতাল' থেকে বিদায় নেওয়া যাক। হয়ত কিছুক্ষণ ধরে আপনারা একটি প্রশ্ন করতে চাইছেন 'এই আশ্চর্য জায়গায় যখন কাউকে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিৎসার খরচ যোগায় কে?'

রোগী যোগায় না – যোগায় সমগ্র জাতি! এরই নাম 'চিকিৎসার সামাজিকতা সাধন' বা 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা'। রাশিয়ার বাইরে বহু চিকিৎসক এই ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।

সম্প্রতি 'মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতাল' পরিদর্শন করতে গিয়ে জনৈক ইংরেজ সামরিক অস্ত্রচিকিৎসক সেখানকার ডাক্তারদের কাছে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা কিন্তু এর কথার মানে বুঝতে পারলেন না। একজন রুশ ডাক্তার বললেন, 'এ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন নয়! ডাক্তার, বলুন তো লণ্ডনে যখন আগুন লাগে তখন কি অগ্নিনির্বাপক বিভাগ যাঁর বাড়ি পুড়ল তাঁর কাছে খরচের বিল পাঠিয়ে দেয়? নিশ্চয়ই না।'

'তবে সেই লোকের যখন অসুখ করে বা দুর্ঘটনা ঘটে তখনই বা তাঁকে টাকা খসাতে হবে কেন? আগুন নেভানোতে যদি সবার স্বার্থ জড়িত থাকে তবে মানুষ যাতে সুস্থ থাকে তার প্রতি নজর রাখার সঙ্গেও প্রত্যেকের স্বার্থ জড়ানো আছে। বরঞ্চ বেশি আছে, কারণ আপনি আবার বাড়ি তুলতে পারেন কিন্তু কবর থেকে আর মানুষকে জিয়োনো যায় না। এর মধ্যে রাজনীতির নামগন্ধও নেই – এ হল সাধারণবুদ্ধির কথা!'

রাশিয়ায় ওরা আরো অনেক দূর অবধি গেছে। কোনো রোগী সেখানে পয়সা খরচ করে না। চাইলেও সে খরচ করতে পারে না। এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যাঙ্কে কত পুঁজি আছে সে হিসাব বাদ দিয়ে প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর সামনেই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থার দরজা খোলা আছে। রোগীর প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা, নার্স, হাসপাতালের জায়গা পাবার অধিকার, চিকিৎসা, পথ্য ও সব রকম সেবাযত্ন সরবরাহ করা হয়। এ সব বিক্রীর সামগ্রী নয়। যদি কেউ এসব কিনবার চেষ্টা করে তো তাকে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ বলে গণ্য করা হয়। কারণ একটা মানুষের জীবন কিনবার সামর্থ্য আছে কার? রাশিয়ায় স্বাস্থ্যের সমস্যা হল এতই সহজ। ■

রিপোর্ট

রাজ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী আইন চালু করতে কনভেনশন

গত ২৪শে জুন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী আইন তৈরির জন্য সরকারের কাছে দাবি রাখতে একটি কনভেনশন হয়।

শ্রী সুরেশ কুন্ডু মহাশয় তার কনভেনশন মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রথমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন নরেন্দ্র দাভালকারের কুসংস্কার বিরোধী আইন তৈরীর আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ যারা বিজ্ঞান আন্দোলনকে গুরুত্ব দেন তারা পশ্চিমবঙ্গে যাতে এই ধরনের আইন তৈরী হয় তার উদ্যোগ নেন। এরপর গত একবছর ধরে এই কুসংস্কার বিরোধী আইনের সপক্ষে নরেন্দ্র দাভালকারের খসড়া, কর্ণাটকে, আসামে ইত্যাদি রাজ্যে তৈরী খসড়াগুলি বিশ্লেষণ করে একটি আইনি খসড়া তৈরী করেন। এরপর গত ৬ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল-কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রী প্রণব চট্টোপাধ্যায় বাবুর হাতে এই খসড়া তুলে দিয়েছেন। প্রণব বাবু টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই আইন তৈরীর কাজটা করবেন। এরপর এই খসড়া বিধান সভার স্পীকারের সাথে সাথে অন্যান্য কিছু প্রভাবশালী লোকেদেরও দেওয়া হয়েছে। সুরেশ বাবু যদিও সংশয়-ও প্রকাশ করেন যে শ্রী নরেন্দ্র দাভালকারের খসড়াটি ২৭ বার এ্যামেন্ডমেন্ড হয়েছে, তাই এটা কতবার হবে তিনি জানেন না!

আইনজীবী শাক্য সেন বলেন সরকার প্রশ্ন করতে পারেDrug & Cosmetics এবং Prevention of Drug & Magical objectional advetising এই আইন দুটি থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন আইন তৈরী করতে হবে। যারা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছে, তাদের জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত করছে তাদের কড়া শাস্তি চাই। উক্ত আইনগুলিতে যা রয়েছে তা এই কাজে যথেষ্ট নয়।

ডঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত বলেন – দৈব্যচিকিৎসার নামে মানুষকে অসুস্থ করা হচ্ছে। পতঞ্জলী মার্কা ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। এগুলোর সাথে ফুড সাপ্লিমেন্ট লেখা রয়েছে যাতে আইন এড়ানো যায়। এই ধরণের ব্যবসাকে আইন দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়। এগুলো অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার। আর বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার হচ্ছে হরলিকস্ খেয়ে Stronger, Taller ইত্যাদি হওয়া। এই ভুয়ো ব্যাপারগুলোর প্রচার বন্ধ করতে আইন দরকার।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির শ্রী দেবাশিষ ভট্টাচার্য বলেন – তার সংগঠন থেকে কিছু প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যা সাপ্লিমেন্টারি প্রপোজাল হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে। সংবিধানে, ২৯২ ধারায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তাতে শৈল্পিক বা বৈজ্ঞানিক কারণে যে অশ্লীলতা তাকে প্রটেক্ট করা হয়েছে। সরকার তার নিজের মত এই আইন প্রণয়ন করে। যে কোন ধর্মের সমালোচনা করলে তাকে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মের যৌক্তিক, মানবিক ও শৈল্পিক সমালোচনাকে রক্ষা করতে হবে। ৩২০ বা ৪৭৬ ধারায় ধর্ষণ বা প্রতারণার বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে কিন্তু ধর্মের নামে মহিলাদের আত্মমর্যাদা হানী বা ধর্ষণকে তার থেকে আলাদা করা উচিৎ। আয়ুস ডিপার্টমেন্টাকেই বাতিল করা উচিৎ। ভোট প্রচারে ধর্মীয় ঘৃণাকে ব্যবহার করা যাবে না, নারকেল ফাটিয়ে সাবমেরিন, রকেট উদ্বোধন থেকে শুরু করে স্কুলের সরস্বতী পুজো অবধি বাতিল করা উচিত।

এরপর শ্রী গিয়াসুদ্দিন বাবু বলেন – কুসংস্কারের জন্য সমাজের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। সমাজের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেলে ওপরের সারির মানুষদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ বা খেটে খাওয়া মানুষেরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই আইন কোন সরকার বা রাজনৈতিক দল সাপোর্ট করবে না, কারণ ধর্মকে সকল রাজনৈতিক দলগুলিই ব্যবহার করে তাদের সুবিধার্থে। একমাত্র জনমতই বাধ্য করতে পারে সরকারকে এই আইন তৈরী করতে। তাই শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও এই আইনের সপক্ষে জনমত তৈরী করার ওপর জোর দিতে হবে।

এরপর একে একে বিভিন্ন ব্যাক্তি বা সংগঠন তাদের বক্তব্য রাখেন। তবে যেহেতু সভা শুরু করতে বেশ দেরী হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য, তাই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রাখতে বলা হয় সঞ্চালকের পক্ষ থেকে। সকলেই এই আইন তৈরীর ক্ষেত্রে জনমতের জন্য প্রচার, পথসভা, মিছিল প্রভৃতির প্রস্তাব দেয়।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র প্রতিনিধিও প্রথমেই এই আইন তৈরীর উদ্যোগকে সমর্থন করে ও পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। তিনি তার স্বল্প বক্তব্যের মাধ্যমে দুটো বিষয়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কুসংস্কার টিকে আছে কেন এবং কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা। তিনি বলেন আইন করে সমাজ থেকে কুসংস্কারের অবসান ঘটান যাবে না। এদেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইন আছে। তবে কি অস্পৃশ্যতার মত জঘন্য, অমানবিক কাজ হয় না? আইন আইনের মত থাকে, সমাজ চলে তার নিয়মে।

অন্যতম উদ্যোগক্তা সুদীপ্ত মৈত্র বলেন প্রথমে তারা ঠিক করেছিলেন যে সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত ধারালো খসড়া করবেন। কিন্তু তা করা যাবে না। কুসংস্কারের দুটো দিক আছে একটা দার্শনিক ও আর একটা কর্মকান্ডের। আমাদের সংবিধানের যে কাঠামো তাতে এই ধরনের বিল আনা যাবে না। ধর্ম বিশ্বাস নিজেই একটা কুসংস্কার। আইন দিয়ে ধর্মবিশ্বাসকে আটকানো যাবে না। ■

বিজ্ঞানের খবর

ফেব্রুয়ারি – ২০১৭

১. কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরীর প্রথম ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করলেন ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক। (ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স)

৬. স্থিতিশীল হিলিয়াম যৌগ - Na_2He সংশ্লেষ করা হলো। (নেচার কেমিস্ট্রি)

৭. পৃথিবী থেকে ৩৮০ আলোকবর্ষ দূরে একটি রহস্যজনক 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার'-এর উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধরনের তারা-র এই প্রথম নমুনা এটি। (ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক)

৮. কিং আব্দুল্লা ইউনির্ভাসিটি অফ্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-র গবেষকরা খাদ্য শষ্যের জিনোম ডিকোড করতে সক্ষম হয়েছেন। (বি বি সি নিউজ)

১৬. অস্টিনের ইউনিভার্সিটি অফ্ টেক্সাসের গবেষকরা অতি নমনীয় এমন একটি 'ন্যানো-ইলেক্ট্রিক থ্রেড ব্রেন প্রোবস'-এর আবিষ্কার করেছেন যা নিউরাল রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষতশুন্য ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২১. অন্তকর্ণের প্রোজেনিটার কোষের বহু পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চুল পড়ার সমস্যার সমাধানের প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

২২. জ্যোতির্বিদরা পৃথিবী থেকে ৪০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এমন সাতটি বহির্নক্ষত্র-র গ্রহের আবিষ্কার করেছেন যাদের মধ্যে প্রাণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।(নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

মার্চ – ২০১৭

১. কানাডার কিউবেক শহরে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে পুরানো একটি ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি একটি অণুজীবের ফসিল যা প্রায় ৪২৮ কোটি বছরের পুরানো। (নেচার পত্রিকা)

২. কানাডার এডমন্টন-এর আলবার্টা ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ডিপস্ট্যাক নামে এমন এক আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম বানিয়েছেন যা পোকার খেলায় একজন পেশাদার খেলোয়াড়কে হারিয়েছে। (ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা)

৭. নাসার 'ক্যাসিনি মিশন' শনির একটি ছোটো চাঁদ 'প্যান'-এর নতুন ছবি পাঠিয়েছে। এই ছবিতে প্যান-এর আকৃতি অনেকটা উড়ন্ত চাকতির মতো। (নাসা)

৮. আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের বিজ্ঞানীরা পদার্থের একটি নতুন দশার সন্ধান পেয়েছেন, এই দশা হচ্ছে টাইম ক্রিস্টাল। (ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস)

৯. দক্ষিণ কোরিয়ার ইনস্টিটিউট অফ বেসিক সায়েন্স এর গবেষকরা 'সিঙ্গল অ্যাটম' মেমরি স্টোরেজ সিস্টেম-এর উদ্ভাবন করেছেন, এর ফলে মেমরি-র আকার আরও ছোটো হয়ে যাবে। (নেচার পত্রিকা)

●কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ইতালির গবেষকরা খেলোয়াড় বা অল্প বয়স্কদের মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

১০. একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের দল পৃথিবীর চারিপাশে মহাজাগতিক ধুলিকণার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

১৬. আমেরিকার মেইন-এর এম. ডি. আই বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরী-র বিজ্ঞানীরা এম. এস. আই-১৪৩৬ নামক হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর হার্ট-মাসল মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য ওষুধের খোঁজ পেয়েছেন। (সায়েন্স ডেইলী)

১৭. ব্রিটেনের ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন-এর বিজ্ঞানীরা ইভোলোকিউ ম্যাব নামক এমন এক ওষুধের আবিষ্কার করেছেন যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কোলেস্টোরাল কমানোর মাধ্যমে হার্ট-অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মত রোগের সম্ভাবনা দারুণভাবে কমাতে পারে। (বি. বি. সি. নিউজ)

১৮. ইন্টারন্যাশানাল এনার্জি এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী পরপর তিন বছর টানা কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর নির্গমন একই রয়েছে। (ইন্টারন্যাশানাল এনার্জী এজেন্সী)

২২. নাসার রিপোর্ট অনুযায়ী আর্কটিক ও অ্যান্ট্যর্টিক দুই জায়গাতেই সামুদ্রিক বরফের পরিমাণ কমেছে। (নাসা)

২৩. হল্যান্ডের এরামাস ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার-এর গবেষকরা বয়স্ক ইঁদুরকে পুণরায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের উপরে পরীক্ষা এখনও বাকি, এর ফলে বয়সজনিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। (বিবিসি নিউজ)

৩০. স্পেশ-এক্স একটি আংশিক ব্যবহৃত রকেটকে ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়েছে। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

এপ্রিল - ২০১৭

৩. হল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাঞ্চেস্টারের গবেষকরা গ্রাফাইন দ্বারা তৈরী ফিল্টারের মাধ্যমে সমুদ্রের জলকে পরিশ্রুত করার নতুন উপায় বার করেছেন, এর ফলে সামুদ্রিক জলকে লবণমুক্ত করা আরও সহজতর হবে। (বি. বি. সি)

১০. আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি-র গবেষকরা নেগেটিভ মাস বা ঋণাত্মক ভরের একটি তরলের প্রদর্শন করছেন। (ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি)

১১. আমেরিকার এম. আই. টি-র হেইস্ট্যাক অবজারভেটরীর গবেষকরা ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের দ্বারা ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। (ন্যাশানাল জিওগ্রাফি)

১২. কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু-র গবেষকরা গ্যালাক্সি-র সাথে ডার্ক-ম্যাটারের সংযোগের কম্পোজিট ছবি সংগ্রহ করেছেন। (ফিজ. ও আর জি)

১৩. নাসার বিজ্ঞানীরা শনির চাঁদ এনসেলাডাস থেকে আণবিক হাইড্রোজেনের ধোঁয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন, এটির কারণ হতে পারে হাইড্রোথার্মাল অ্যাক্টিভিটি যা আসলে জীবের আদিপর্বের উপস্থিতির কারণে হতে পারে। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

● ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে-র গবেষকরা এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা ১২ ঘন্টায় ২.৮ লিটার জল বাতাস থেকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম। খুব অল্প আদ্রতার বায়ু থেকেও এটি জল নিষ্কাশন করতে পারে।
(জিফ. ও আর জি)

২০. ইংল্যান্ডের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল-এর গবেষকরা ট্রাজোডোন, ডাইবেনজোলামিথেন নামক এমন দুটো ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা নিউরোডিজেনেরেটিভ সংক্রান্ত মস্তিষ্কের অসুখের ফলে কোষ মৃত্যু-র ঘটনাকে কমাতে সক্ষম। (বি. বি. সি. নিউজ)

২৪. ওয়াক্স মথের লার্ভা পলিইথিলিনকে বায়োডিগ্রেড করতে সক্ষম। এর ফলে ভবিষ্যতে প্লাস্টিককে বিয়োজনক করা সম্ভব হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৫. আমেরিকার গবেষকরা ভেঁড়ার শরীরে কৃত্রিম গর্ভ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, এর ফলে প্রি-ম্যাচিওর মানব শিশুকে রক্ষা করাও ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৮. টোকামাক এনার্জি নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানী ঘোষণা করেছে যে তারা এস. টি. ৪০ এর প্লাজমা অবস্থা অর্জন করার মাধ্যমে ফিউশান রি-অ্যাক্টর-এর প্রোটোটাইপ বানাতে সক্ষম হয়েছে। (টোকামাক এনার্জি)

মে - ২০১৭

১. আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ উটাহ-র গবেষকরা এমন এক রোবোটিক ড্রিল সিস্টেম আবিষ্কার করেছেন যা করোটির সার্জারি করতে সাধারণ উপায়ে থেকে ১৫ ভাগের ১ ভাগ সময় নেবে। (সায়েন্স ডেইলি)

৪) ইউরোপিয়ান এক্স-রে ফ্রি ইলেক্ট্রন লেজার তার প্রথম এক্স-রে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এর সাথে যুক্ত ছিলেন। (স্কাই নিউজ)

● ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ডের ভেনেসা রেস্ট্রেপো সিল্ড নামক ২৮ বছর বয়সী একজন ছাত্রী বায়োলজিকাল টিস্যু দিয়ে কৃত্রিম রেটিনা আবিষ্কার করেছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

১০. ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা-র গবেষকরা এমন এক 'বায়োনিক স্কিন' আবিষ্কার করেছেন যা রোবটকে মানুষের মত স্পর্শের অনুভূতি দেবে। (ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা)

১৬. 'এ. আর. এম' ও 'সেন্টার ফর সেনসোরি মোটোর নিউরাল এঞ্জিনিয়ারিং'-এর উদ্যোগে একটি চিপের মধ্যে 'ব্রেইন ইম্পান্টেবল' ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন যা 'বাই-ডিরেকশনাল ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেজ'-এর কাজ করতে সক্ষম হবে। এরফলে স্নায়বিক বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। (বি. বি. সি)

১৭) বস্টন চিলড্রেন হসপিটাল-এর গবেষকরা মানব স্টেম কোষ ল্যাবরেটরীকে পূর্ণতা দিতে পেরেছেন। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

১৮. নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তৃতীয় বৃহত্তম বামন গ্রহ (২২৫০৮৮) ২০০৭ ও. আর ১০ আবিষ্কার করেছেন। (নাসা)

● একটি অস্ট্রেলীয়-চীনা গবেষকদের দল পৃথিবীর সবচাইতে পাতলা হলোগ্রাম আবিষ্কার করেছেন, এটি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যের নানাবিধ কাজে আসবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৪. সুইজারল্যান্ডের গবেষকরা এমন একটি কৃত্রিম ভাইরাসের আবিষ্কার করেছেন যা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় কাজে আসবে। (ইউনিভার্সিটি অফ্ জেনেভা)

২৬. ইউরোপের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপের গঠন চালু হয়েছে। এটির প্রধান কাঁচের দৈর্ঘ্য ৩৯ মিটার। (রয়টার)

৩০. স্ক্রিপ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা এমন একটি ভ্যাঙ্কোমাইসিন-এর আবিষ্কার করেছেন যা অ্যান্টি-বায়োটিকের কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। (বি. বি. সি. নিউজ)

● ৩৫২ জন বিশেষজ্ঞ-র মতে আগামী ৪৫ বছরে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষ দ্বারা কৃত কাজের ৫০ শতাংশ ও আগামী ১২০ বছরে সব ধরনের কাজকে অটোমেশান দ্বারা করতে সক্ষম হবে। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

জুন – ২০১৭

১. জোতির্বিজ্ঞানীরা জি ডব্লু ১৭০১০৪ নামক একটি তৃতীয় গ্র্যাভিটেশনাল তরঙ্গের খোঁজ পেয়েছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

● নাসার 'কিউরিওসিটি রোভার' মঙ্গলের গেল গহ্বরে একটি প্রাচীন হ্রদের খোঁজ পেয়েছে যেখানে আণবিক জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে। (নাসা)

৭. নর্থ আফ্রিকার মরক্কোতে বিজ্ঞানীরা এমন ফসিল পেয়েছেন যার দ্বারা বলা যেতে পারে যে 'হোমো-সেপিয়েন্স'-এর আর্বিভাব হয়েছিল ৩ লক্ষ বছর আগে। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

৯. ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ, সুইজারল্যান্ডের গবেষকরা বৃহত্তম কৃত্রিম বিশ্বের আদল তৈরী করেছেন যাতে ২৫ বিলিয়ান গ্যালাক্সি রয়েছে। (ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ)

১২. হল্যান্ডে ভু ইউনিভার্সিটি অফ অ্যামস্টারডম-এর গবেষকরা ইনসমনিয়া রোগের সাতটি জিনকে চিহ্নিত করেছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

১৫. চীনের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে উপ-কক্ষীয় শুন্যে ফোটন কণা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মিকিউয়াস নামক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। (সায়েন্স ডেইলি)

১৮. ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির গবেষকরা এমন একটি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন যা ইঁদুরের মধ্যে ক্ষতিকারক কোলেস্টোরল পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এই গবেষণা কার্ডিও-ভাস্কুলার রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করতে পারে। (ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি)

১৯. জোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের এক-দশমাংশ আকারের একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন সৌর মন্ডলের একেবারে ধারে। (নিউজ উইক)

২০. নাসার কেপলার স্পেশ টেলিস্কোর বিজ্ঞানীরা ২১৯টি নতুন বহির্নক্ষত্র মন্ডলে অবস্থিত গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। (নাসা)

২২. কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষকরা উদ্বেগের জন্য দায়ী নিউরনকে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং এর ফলে পুরানো অন্যান্য স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাবে না। (সায়েন্স ডেইলি)

৩০. জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশান এজেন্সি ২০৩০ সালে চাঁদে নভোশ্চরদের প্রেরণের ঘোষণা করলো। (ফিজ, ও আর জি)

জুলাই – ২০১৭

৪. হোমো-সেপিয়েন্সদের ২,৭০,০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

৫. আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণা অনুযায়ী সারা বিশ্বের কার্বন এমিশন তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে নি যাকে বিপদজনক বলা যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর গরম হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি ছিল, কার্বন এমিশান বাড়ার ফলে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে তা সম্ভাবনার তুলনায় কম। (দ্যা গার্ডিয়ান)

৬. সার্ন-এর লার্জ হেড্রন কোলাইডার-এর পদার্থবিদরা দুটি চার্ম কোয়ার্ক ও একটি আপ কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত এক নতুন কণার খোঁজ পেয়েছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স)

৭. অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির গবেষকরা জেনেটিকালি মডিফায়েড এমন এক কলার আবিষ্কার করেছেন যাতে ভিটামিন 'D'-এর পরিমাণ অনেক বেশি এবং তা কলার পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে দেবে। (সায়েন্স ডেইলি)

১০. নাসার জুনো মহাকাশযান বৃহস্পতির লাল-দাগের অনেক ছবি তুরেছে। (নাসা)

১১. জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন এক নতুন ধরনের সোলার সেলের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন করেছেন যা বিদ্যমান সোলার সেলের থেকে ৪৪.৫% বেশি কার্যকরী। (জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি)

১২. ই. বি. এল. এম জে০৫৫৫-৫৭ এ বি নামক ক্ষুদ্রতম এমন এক নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যার ব্যাস শনি গ্রহের থেকে সামান্য বড়। (ফিজ, ও আর জি)

১৭. পৃথিবীর নিকটবর্তী লাল রঙের গ্রহ রস ১২৮ থেকে জোতির্বিদরা কিছু অজানা রেডিও সিগন্যাল পেয়েছেন। (নিউজ উইক)

১৯. নৃ-তত্ত্ববিদরা এমন তথ্য পেয়েছেন যা প্রমাণ করে যে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মানুষরা ৬৫ হাজার বছর পূর্বে ওই মহাদেশে প্রবেশ করেছিল, আগের পাওয়া তথ্য থেকে এটি ১৮০০০ বছরের পুরানো। (বি. বি. সি)

২১. অ্যাস্টেরয়েড ২০১৭ ৩৩১ পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। (সায়েন্স ডেইলি)

২৬. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অফ মেডিসিনের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন – মস্তিষ্কের হাইপো থ্যালাসাসের স্টেম কোষ আসলে বয়ঃবৃদ্ধি নিধারণ করে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৮. ভিনাইল সায়ানাইড নামক এমন একটি জৈব যৌগের খোঁজ শনির চাঁদ টাইটান -D পাওয়া গেছে যা প্রাণের জন্য অতি আবশ্যক। (স্পেশ. কম) ■

পাঠকের কলাম

প্রকৃতি বিজ্ঞানে ‘কার্ল লিনিয়াস’-এর অবদান

– ইন্দ্রনীল মজুমদার

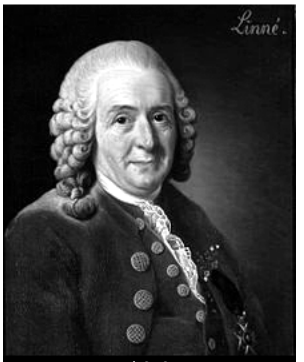

কার্ল লিনিয়াস

“আমাদের পরিবেশে নানা পশু-পাখি-কীটপতঙ্গ ও গাছপালা দেখা যায়। নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই ‘সবুজ পৃথিবী’। জীবজগতে বৈচিত্র্যের যেমন অভাব নেই তেমনি কত রকমের যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে এই পৃথিবীতে তারও হিসেব নেই। প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রায় কয়েক লক্ষ প্রজাতির দেখা যায়, বলা যায় কয়েক লক্ষ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস এই পৃথিবীতে। এতো সব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চেনার ও জানার সুবিধার জন্য তাদের কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিল ও অমিল লক্ষ্য করেই প্রধানতঃ এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের কাজটি মোটেই সহজ ছিল না, অনেক বিজ্ঞানীর নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় যিনি সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করেন, তিনি **‘কার্ল লিনিয়াস’** (Carl Linnaeus)। তিনি বিজ্ঞাস সম্মত উপায়ে সর্বপ্রথম প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়াস রেখেছিলেন। তাঁর দেখানো পদ্ধতি পরবর্তী কালে আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়েছে। তাই প্রাণী ও উদ্ভিদের আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক নামকরণে তাঁর অবদান সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়।

কার্ল লিনিয়াস ১৭০৭ সালের ২৩শে মে সুইডেনে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ‘নিল্‌স লিনে’ যিনি একজন ধর্মযাজক ছিলেন। ওঁদের বাড়ির সামনে একটি বাগান ছিল, তাতে নানা গাছপালা ছিল। নিল্‌স তাঁর এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন এই বাগানে বেড়াতেন তখন বিভিন্ন গাছপালা দেখিয়ে তাদের নাম বলে দিতেন। এর ফলে কার্ল ছোটবেলা থেকেই উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ এবং কৌতুহলী করে তোলে। বাবা-মা’র ইচ্ছে ছিল কার্ল বড়ো হয়ে যেন ধর্মযাজক হয়। কিন্তু ছেলের বাইবেলের চেয়ে প্রকৃতিতে আগ্রহ ছিল বেশি। একদিন বাবা-মাকে তো স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, তিনি ধর্মযাকজন নয় প্রকৃতি বিজ্ঞানী হতে চান। আশা ভঙ্গ হওয়াতে বাবা-মা মনে আঘাত পেলেও ছেলেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী হওয়াতে বাধা দিলেন না বা নিরুৎসাহিত করলেন না। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হলেন। তখন অধ্যাপক হিসেবে পেলেন **ওলুফ্ রূডবেক**-কে যিনি তাঁর জ্ঞান ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন ছাত্র লিনিয়াসকে। লিনিয়াস হয়ে উঠলেন উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী। বিজ্ঞানী স্বভাব তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল তাই সে পরীক্ষা ছাড়া শোনা কথায় বিশ্বাস করতেন না। ১৭৩২ সালে অধ্যাপক রূডবেকের নির্দেশে লিনিয়াস ল্যাপ্ ল্যান্ডে যান। এই অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথানুসন্ধানের জন্য।

লিনিয়াস অভিযান শেষ করে উপসালায় ফিরে এসে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেন রয়্যাল সোসাইটিতে। সেই রিপোর্টে তিনি ল্যাপল্যান্ড বাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ দেন। এর সাথে সেখানকার অজস্র প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পদেরও বিবরণ দেন। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন কত রকমের দুস্প্রাপ্য উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ।

ল্যাপল্যান্ডে গবেষণার কাজে থাকার সময়ই তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবিভাগ সূচনা করেন। তিনি দ্বিপদী নামকরণের শ্রষ্টা। লিনিয়াস সাহেবই প্রথম জীবজগৎকে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলে শ্রেণীবিভাগ করেন। এই অর্থে তিনি জীবজগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রথম প্রবক্তা। তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলোর নামকরণের নৈরাজ্য দূর করে দ্বিপদী নামকরণ চালু করেন। তাঁর প্রবর্তিত নামকরণের আগে বিভিন্ন প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম ছিল অনেক দীর্ঘ। লিনিয়াস প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের দুটি করে ল্যাটিন নাম দেন। তিনি নির্দেশ দেন যে প্রথম নামের প্রথম অক্ষর বড়ো হাতের হরফে লিখতে হবে। প্রথম নামটি বোঝাবে যে প্রাণী বা উদ্ভিদটি কোন genus (গণ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় নামটি বোঝাবে ওই প্রাণী বা উদ্ভিদটি কোন Species (প্রজাতি)-র তাঁর পদ্ধতি অনুসারে জীবের আগে গণ পরে প্রজাতি ঠিক করা হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় Linnaean System অথবা Binomial Nomenclature. (দ্বিপদ নাম বা দ্বিপদীয় নামকরণ বা লিনীয় প্রণালী)। লিনিয়াস মানুষ প্রজাতির নাম রাখেন Homo sapiens (হোমো স্যাপিয়েন্স)।

সংগঠন সংবাদ

গত **২রা এপ্রিল সোনারপুর (দঃ ২৪ পরগণা) সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউট হলে** দুপুর ২-৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা অবধি বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বিজ্ঞান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। একই অনুষ্ঠান হয় **কলকাতার (বেহালা চৌরাস্তা) বেহালা মহিলা মহাবিদ্যালয়-এর হলে**। দুটি অনুষ্ঠানেই পাঠকদের মতামত, ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন, বিতর্ক এবং সেমিনার হয়। সোনারপুরের সেমিনারের বিষয় ছিল – 'প্রযুক্তিগত উন্নতি বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ' এবং বেহালার অনুষ্ঠানে বির্তকের বিষয় ছিল – 'কুসংস্কার টিকে থাকার কারণ মানুষের অজ্ঞতা'। উভয় অনুষ্ঠানেই 'চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল হকিকৎ এবং সমাধানের পথ' শিরোনামে স্লাইড শো-র মাধ্যমে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক অনুষ্ঠান দুটি-তে অংশগ্রহণকারীরা মনোজ্ঞ বক্তব্য ও যুক্তি তুলে ধরেন। প্রথম অনুষ্ঠানে পরিচালনায় ত্রুটি ছিল। সেমিনারটিতে যে বক্তব্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। পাঠকদের মতামতে উল্লেখযোগ্য সাজেশন, মতামত বা সমালোচনা উঠে আসে নি। একজন পাঠক হিন্দীতে পত্রিকা প্রকাশের চাহিদা ব্যক্ত করেন। নিয়মিত প্রকাশ না হওয়ার জন্য সমালোচনা উঠে আসে। সংগঠনের সদস্যদের উদ্যোগে গঠিত টীম গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সবশেষে সংগঠনের সদস্যরা "আলোর পথিক" শিরোনামে একটি শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন। শ্রুতি নাটকটি পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছে।

১লা এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল **নদীয়া জেলার নবদ্বীপ** শহরের বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল গত বছরের ন্যায় দেওয়া

● *পরের পাতায় দেখুন* ➔

তিনি ভিন্নার্থে এটি ব্যবহার করেছিলেন হোমো স্যাপিয়েন্স হলো হোমো 'নসে তে ইপসাম' অর্থাৎ ম্যান নো দাই সেলফ – আত্মনাং বিদ্ধি – মানুষ নিজেকে জানো। তাঁর এই অভিধা গভীরতম অর্থবহ। আগের মানুষরা হলো হোমো ইরেকটাস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো নিয়ান্ডারথেলেনসিস ইত্যাদি এরা লোপ পেয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে লিনিয়াস তাঁর আবিষ্কৃত উদ্ভিদ বা জীবের নামের সঙ্গে তাঁর নিজের নামের আদ্যক্ষর 'L' যুক্ত করেছিলেন যেমন Bellis perennis L. (common daisy). ল্যাপল্যান্ডের অভিযানের তিন বছর বাদে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের সংকলন এক পুস্তক 'Systema Naturae' ১৭৫৮-তে প্রকাশিত করেন। তিনি ৭৭০০ প্রজাতির উদ্ভিদের এবং ৪৪০০ প্রজাতির প্রাণীর নামকরণ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তকগুলি হল স্পিসিস প্লান্টারাম (১৭৫৩), জেনেরা প্লান্টারাম (১৭৫৪)। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ ও উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকের পদের জন্য তিনি সেই কাজেও নিযুক্ত হন। অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসতো। তিনি তাদের শুধু পড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না। বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়ে অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের বিভিন্ন গাছপালা চেনাতেন। এমন শিক্ষক সত্যিই দুর্লভ। ১০ই জানুয়ারি ১৭৭৮ সালে ৭০ পেরিয়ে এই সুমেরীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও প্রাণীবিজ্ঞানী তথা পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী আমাদের চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যান।

তিনি আধুনিক দ্বিপদী নামকরণের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাঁকে আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা (TAX-ONOMY)-র জনক বলা হয়। এর সাথে তিনি আধুনিক বাস্তুবিজ্ঞান (ECOLOGY)-র জনকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

বিজ্ঞানী লিনিয়াসের অবদান অন্য আর একটি দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। লিনিয়াসের কর্মকাল ছিল প্রাক্ ডারউইন যুগে। অর্থাৎ তাঁর সময়ে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণের বিবর্তন তথা জিন তত্ত্বের কোন জ্ঞান ছিল না। তদ্‌সত্ত্বেও, কেবলমাত্র বাহ্যিক গুণাগুণ দেখে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই তিনি শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। তাই প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন মহৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানী। ডারউইন পরবর্তী যুগে বিবর্তনবাদ ও জিনতত্ত্বের বিকাশের সাথে সাথে প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতির ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেছে ও বর্তমানে তা বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়েছে। তাই লিনিয়াসের নামকরণ পদ্ধতিকে 'কৃত্রিম' আখ্যা না দিয়ে ধারাবাহিকতার আলোকে বিচার করতে হবে। আধুনিক পর্যায় সারণী গঠনের ক্ষেত্রে মেন্ডেলিফের ভূমিকা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি প্রাণীবিজ্ঞানের ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে কার্ল লিনিয়াসের নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।■

হয়। স্টলে অনেক পাঠক আগ্রহ ভরে সমীক্ষণ সংগ্রহ করেন।

১৬ই এপ্রিল **জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি**গ্রামে বিশ্ব বাংলা মুক্তমঞ্চে, স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা অবধি এক গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকা, স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের নৃত্য ও গানের অনুষ্ঠান হয়। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ৫ জন ছাত্র মডেল প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে কয়েক জনের উদ্ভাবনী শক্তি ও বাচনভঙ্গী ছিল চমৎকার। এরপর ভন্ড সাধু, গুণিনদের তথাকথিত অলৌকিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ ঠকানোর স্বরূপ উন্মোচন করা হয় বিজ্ঞানের প্রদর্শন দ্বারা। সবশেষে হয় সেমিনার 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি'।

১৪ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিল **দঃ ২৪ পরগণা জেলার সুভাষগ্রামে** বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল ছিল একটি অন্যতম আকর্ষণ।

গত ২৭শে মে দঃ ২৪ পরগণা জেলার **সুভাষগ্রামে** একটি গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। তথাকথিত অলৌকিকত্বকে খন্ডন করার জন্য বিজ্ঞানের প্রদর্শন করা হয়। কুসংস্কার টিকে থাকার উৎস নিয়ে চর্চা করা হয়। এরপর হয় 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' শীর্ষক স্লাইড শো।

১লা এপ্রিল থেকে **দঃ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রাক্ষসখালি** (সুন্দরবন) অঞ্চলে ২ দিন ব্যাপী বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন; বিজ্ঞানের খেলা দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে মিহির সেন রচিত ছোট্ট নাটিকা 'ধম্ম যখন ছোঁয়ালেন হুজুর' প্রদর্শিত হয়।

গ্রীষ্মকালীন সময় **সুন্দরবনের ব্রজবল্লভপুর, পাথরপ্রতিমা** এবং **বরদাপুর** অঞ্চলে ছাত্রদের মধ্যে কি কি কুসংস্কার আছে তার অনুসন্ধান করে এইসব কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়।

১৯শে জুলাই **দঃ ২৪ পরগণা জেলার গাববেড়িয়া মাস্টার মোড়ে** যুক্তিবাদী প্রদর্শন এবং 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' নিয়ে স্লাইড শো করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

২৩শে জুলাই **দঃ চব্বিশপরগণার গোচরণ** এলাকার **দেওয়ানগঞ্জ এ কে হাইস্কুলে** 'মানুষের বিবর্তন এবং 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার ছুটির দিনেও ছাত্রছাত্রীদের বিপুল অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

৩০শে জুলাই **হাওড়া জেলার আমতা থানার পুরাষ** গ্রামের ২টি জায়গায় যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের প্রদর্শন এবং 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' শীর্ষক স্লাইড শো করা হয়।

২৯শে এবং ৩০শে অগাস্ট **হাওড়া জেলার আমতা থানার পুরাষ-কানপুর নটবরপাল বিদ্যামন্দিরে** স্কুল কর্তৃপক্ষের আহ্বাণে ২ দিন ব্যাপী আলোচনা ও সেমিনার করা হয়। ২৯শে অগাস্ট 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তার মোকাবিলা' শীর্ষক বিষয় নিয়ে বন্যা-খরা-ভূমিকম্প-ব্রজপাত-ঝড়-অগ্নুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ এবং তার বৈজ্ঞানিক সমাধান রাখা হয়। স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীকে জায়গার অভাবে এই অনুষ্ঠান দেখানো যায় নি। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ রেখেছেন অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পরদিন ৩০শে অগাস্ট কুসংস্কার এবং তার উৎস ও দূর করার উপায় নিয়ে বিজ্ঞানের প্রদর্শন এবং সেমিনার করা হয়।

৩০শে অগাস্ট সন্ধ্যায় **হাওড়া জেলার আমতা থানার কানপুর গ্রামের কালিতলা এলাকায়** কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রদর্শন এবং 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' নিয়ে সেমিনার করা হয়।

দঃ ২৪ পরগণা জেলার লক্ষ্মীকান্তপুর ইউনিট সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীষ্মকালীন স্থানীয় **গাববেড়িয়া** এবং **সুলতানপুর** গ্রামে গ্রামীণ অনুসন্ধান চালায়। অনুসন্ধানে ছাত্র ও তার পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থা, সমাজে টিকে থাকা কুসংস্কারগুলি, গ্রামীণ চিকিৎসার হাল, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কেন তার অনুসন্ধান করা হয়। সিলেবাসে টিকিয়ে রাখা অবৈজ্ঞানিক-অবাস্তব বিষয়গুলি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কারণ সম্বন্ধে মানুষের কি জানা আছে ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয়। এছাড়া গত ২৩শে জুন স্থানীয় **গাববেড়িয়া হাইস্কুলে** সমীক্ষণের প্রচার হয়েছে।

এছাড়া **দঃ ২৪ পরগণার গোচরণ, লক্ষ্মীকান্তপুর, আশুতি** প্রভৃতি অঞ্চলে এবং **উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ** অঞ্চলে স্থানীয় গণসংগঠনগুলির সাথে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে গ্রামীণ জনতার সমস্যা কী তা জানার ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালানো হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই সমস্যাগুলির উৎস কী এবং তার সমাধানের পথ নিয়ে চর্চা হয়। সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েতের জনগণ কিভাবে ওই সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করেছিল সে বিষয় আলোচনা চালানো হয়। এই কর্মসূচী রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে লাগু আছে।■

বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভব ও বিকাশ

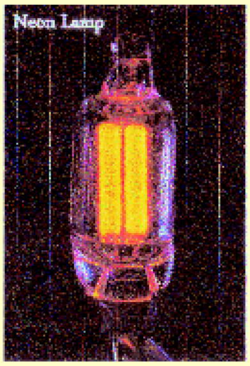

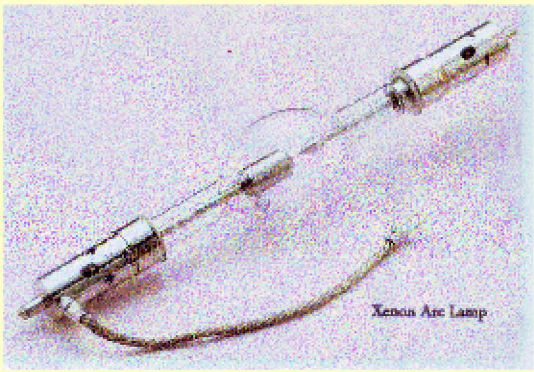

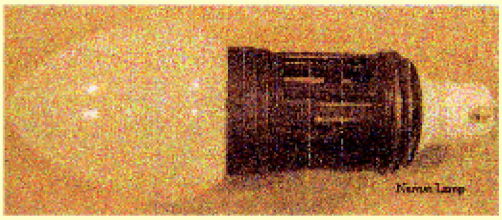

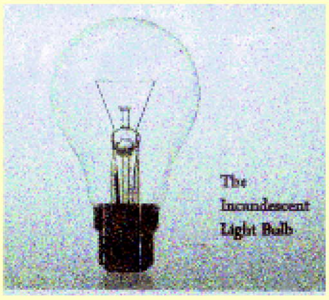

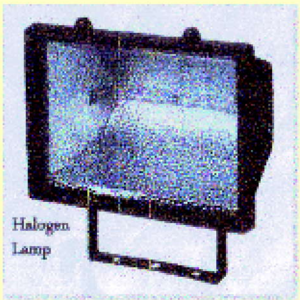

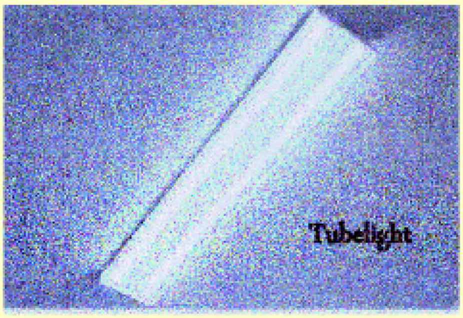

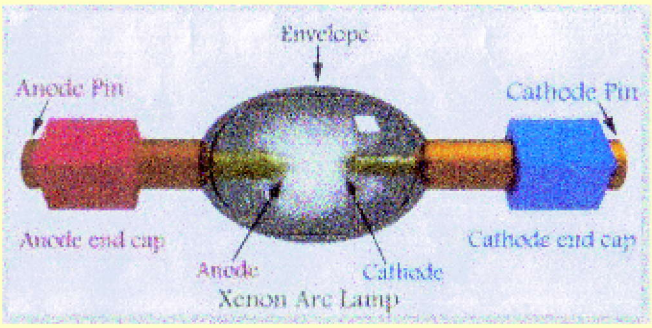

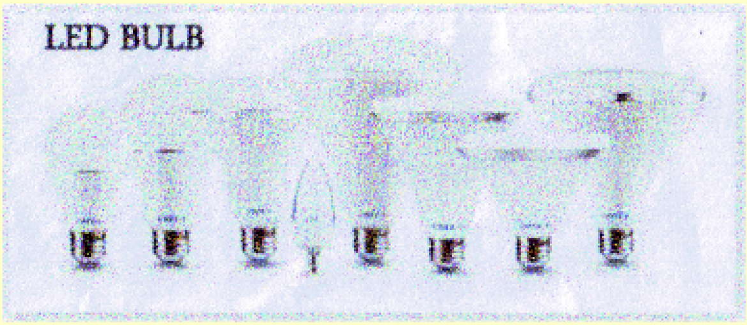

বিজ্ঞপ্তি

অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে, সমীক্ষণ-এর আগামী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

বিজ্ঞান এবং শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে ৯ই অগাস্ট, ২০১৭ কলকাতায় পদযাত্রা

বেহালা মহিলা কলেজ

সোনারপুর

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র বার্ষিক অনুষ্ঠান

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : শিশির কর্মকার : ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক : নন্দা মুখার্জী : ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com সহযোগিতা রাশি : ১০ টাকা